দ্বিতীয় অধ্যায়

লোক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট ঃ প্রধান বৈশিষ্ট্য

[১]

আলোচ্য প্রকল্পের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে এপার-ওপার বাংলার বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নের চরিত্রধর্ম। মূলত সামাজিক তথা রাজনৈতিক বিবর্তনের কারণেই এই সময়ের বাংলা কবিতার চরিত্র বদলে যেতে শুরু করে। নানা কারণে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বদলে যাচ্ছিল। স্বাধীনতা লাভের কয়েক দশক ধরে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন, মার্কসবাদের প্রসার প্রভৃতি কারণে সমাজ-পরিস্থিতিতে নৈতিক আদর্শ ভেঙে পড়েছিল। বাংলা কবিতার পরিবর্তনের এই সব কারণের সাথে যুক্ত হয়েছিল পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শ ও বিশ্বজোড়া বিজ্ঞান চেতনার বিবর্তন। বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর মৌল পার্থক্য বাংলা কবিতার চরিত্র-বিবর্তনের কারণ হয়েছিল। কাল-প্রসৃতির অন্তর্ভুক্ত ঘটনাধারা এ সময়ের কবিদের প্রভাবিত করেছিল। কবিতায় চিত্রকল্পের বিষয়টি নতুনভাবে চিন্তা করেছিলেন এই সময়ের কবিরা। প্রচলিত মূল্যবোধের সংশয় ও নৈরাশ্যবোধের তীব্রতা জনিত একাধিক চিত্রকল্প এই সময়ে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে আশ্রয় করে নির্মিত হয়েছিল। ব্যাপক সংহার, তাণ্ডব, ক্ষমতার অধিকারজনিত নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা, সাধারণ মানুষের অসহায়তা-এ সব কিছুই চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছিল -যার অনেকগুলিই লোক-জীবন থেকে আহৃত। এ সময়ে নৈরাশ্যবোধ সমাজের পশ্চাৎপদ দরিদ্র মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে নিরাময়প্রলেপ হিশেবে কাজ করতে পারেনি। জাগতিক দুঃখ-কষ্টকে ঈশ্বরীয় বিধান বলে কবিরা আর মেনে নিতে পারছিলেন না। যুগসঞ্চিত সংস্কারগুলো বিবর্ণ, মলিন হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। সৎভাবে জীবন যাপন করলেই যে পুণ্যফল জনিত স্বর্গলাভ সম্ভব- এই আস্থায় স্থিত থাকা কবিরা আর কর্তব্য বলে মনে করছিলেন না। এই ‘অবিশ্বাস’ -মনোভঙ্গি নৈরাশ্য জয়ের শক্তি জুগিয়েছিল কবিদের। তাই আনন্দ ঘোষ হাজরার ‘জন্ম ১’ কবিতায় ধ্বনিত হয় শূণ্যতার আরতি বন্দনা শেষ করার নির্দেশ,‘ওঠো, শূণ্যতার

আরতি বন্দনা শেষ করো, / মূর্ত হও, ভারী হও, খোঁজো পাদপীঠ ।' এই সময়ে ধনতন্ত্রও কবিমনের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছে । পৈতৃক পরম্পরা বাহিত পদাধিকারের পরিবর্তে ব্যক্তিমানুষের চেষ্টায় অর্জিত সমাজের অধিকার কবির মন থেকে দূর করে দিচ্ছিল ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ধর্মগুরু ইত্যাদি সম্পর্কিত নির্ভরতা । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকীয় আর্থ-সামাজিক ধারণা ও পদ্ধতিতে কবিরা আঘাত হেনেছিলেন, যুক্তির তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, ব্রাহ্মণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে । কিন্তু তবুওতো কমেনি তীর্থযাত্রা, মন্দির-দর্শন, দীক্ষা গ্রহণের প্রবণতা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জাঁক-জমক । এই সব অবস্থান প্রসঙ্গে কবিদের বক্তব্য কিন্তু আলাদা । তাঁরা বলেন, 'সাধারণভাবে পৃথিবীর প্রশাসনিকনীতি, আইন-শৃঙ্খলা ও শিক্ষা পদ্ধতি মোটের ওপর ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবেই পরিকল্পিত ও পরিচালিত হচ্ছে । প্রত্যক্ষত যাঁরা ধর্ম প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে যুক্ত তাঁরাও যে শাস্ত্র মেনে বা ধর্ম ভয়ে তাঁদের ঐহিক কর্তব্য সমূহ নির্ধারণ করে থাকেন তা নয় । বরং তাঁদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বাস্তববোধ, বিজ্ঞান চেতনা, ঐহিকতার আদর্শ । রোগে বা বিপদে, সন্তান পালনে, সঞ্চিত অর্থের নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগে, পারমার্থিকতার তুলনায় ঐহিক ব্যবস্থাদির উপরই তাঁরা নির্ভর করেছেন বেশি । বৈধব্য প্রথার কঠোরতা, সতীত্বের মোহ, পুরোহিততন্ত্র, দেবদাসী প্রথা - ইত্যাদি সবই এখনো এদেশে প্রচলিত আছে । তবু তা ক্রমশিথিল ।'[১]

বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নের বাংলা কবিতায় লোকবীক্ষা ও লোকাভরণ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । এই সময়ে সমাজে পুঁজিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল । পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যই হল এই যে সমাজে পুঁজির বিকাশের সাথে সাথে বেকারিত্ব বাড়ে এবং বেকারত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো মূল্যবোধের পতন হয় । বিশ্বযুদ্ধ গুলি আন্তর্জাতিক স্তরে ঐ পুঁজিবাদী স্বার্থেরই ভয়ংকর সংঘাত । কিন্তু যুদ্ধ যেহেতু লোক সমাজের ক্ষেত্রে হিতকর নয় তাই তা কখনোই শান্তি স্থাপন করতে পারে না । যুদ্ধ হওয়া মানেই জনসাধারণের ব্যাপক দুর্গতি । এই দুর্গতির ফলে সমাজের মূল্যবোধ গুলি স্বাভাবিক ভাবেই ভেঙ্গে যায়, অন্যদিকে জীবনধারা বিশৃঙ্খল,উশৃঙ্খল, আত্মমুখ পরায়ণ, ভৌতসুখকামী, কামসর্বস্ব, রুক্ষ, হতাশ, অপরাধপ্রবণ,

আত্মদংশনে ক্ষত-বিক্ষত, মানসিক বিকারগ্রস্ত ইত্যাদি নানানতর ব্যাধির শিকার হয়ে পড়ে। দার্শনিক প্রতিভাসে তখন সমাজের এই বিশেষত্বগুলি সাহিত্যে স্থান লাভ করে অথবা সাহিত্যের বর্ণিতব্য বিষয় তখন এই বিশেষত্ব গুলিকেই আশ্রয় করে অথবা নায়ক-নায়িকা বা অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর মধ্যে তখন ঐ ব্যাধিগুলির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এর ফলে কেবল সাহিত্যের বিষয়েরই খিন্নতা ও গ্লানি থেকে আলোয় উত্তরণের জন্য মানুষের যে লড়াই, এই বিশাল যুগের কবিদের অনেকেই তা তুলে ধরেছেন লোকজীবনের প্রতি অস্তিবাদী বিশ্বাসে। জীবনের, সমাজের, কিংবা জীবন ও সমাজে ঘটমান ঘটনা ধারার প্রত্যক্ষ রূপ বস্তুসত্যের যথাযথ মূল্যে উপস্থাপিত হয়েছে স্বাভাবিকতাকে অক্ষুন্ন রেখেই।

সাধারণ মানুষ জীবনের পথে হাঁটে বেশ কিছু বিশ্বাসকে বুকে আঁকড়ে ধরে। এই বিশ্বাসগুলি পুরুষানুক্রমে প্রচলিত থেকে শেষ পর্যন্ত একদিন সংস্কারের রূপ নেয়। বলা বাহুল্য, এই সংস্কারগুলি মানুষের রক্তের মধ্যেই বেঁচে আছে, রক্তের মধ্যেই খেলা করছে। এক কথায় বলতে গেলে একদিনের বিশ্বাস কয়েক পুরুষের ব্যবধানে সংস্কারের রূপ পরিগ্রহ করে। এই সংস্কার ও বিশ্বাসগুলিই সাধারণ মানুষের জীবনচর্চাকে নানা ভাবে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও আধুনিক মন এ গুলি সম্পর্কে যতই অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা প্রকাশ ও পোষণ করুক না কেন, সাধারণ মানুষের জীবনে এ গুলির প্রভাব অসীম ও অসামান্য। সংস্কার বহু ক্ষেত্রেই মানুষের বোধ ও বুদ্ধির উপরে জয়ী হয়ে থাকে। বিধবা বিবাহ বহু পূর্বেই আইন সংগত হওয়া সত্ত্বেও আজও হিন্দু সমাজের সম্মতি আদায় করতে পারেনি - তার দুর্বোধ্য কারণ এই সমাজ সংস্কারের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কবি যেহেতু সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা নয়, তাই তার মধ্যেও লোক জীবন সম্ভূত সংস্কারের শিকড় প্রোথিত হয় নানা সূত্রে এবং এই সংস্কারই কমবেশি প্রভাবিত করে কবির কাব্য-চৈতন্যকে।

এ কথা সত্য যে মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিকাশ এবং শিল্পায়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহু সংস্কার ও বিশ্বাসের হয় অবলুপ্তি ঘটেছে অথবা সেগুলি মার্জিত, রূপান্তরিত হয়েছে। বহু সংস্কার এখনও গ্রাম-বাংলার মানুষের মনে দুর্মর হয়ে আছে। বস্তুত

মানুষের জীবনকে, বিশেষত গ্রাম-বাংলার মানুষের জীবনকে সংস্কার ও বিশ্বাসের জীবন বলে উল্লেখ করলেও অত্যুক্তি হয় না। জন্ম থেকে জড় (মৃত্যু) পর্যন্ত নানা সংস্কারের দায়ভাগ মানুষ বহন করে চলেছে এবং এই দিক দিয়ে এই সংস্কার ও বিশ্বাসের সূত্রেই পূর্ববর্তী কালের সাথে একটা নিঃশব্দ ও নিগূঢ় যোগসূত্রের ধারা অবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। অতি শক্তিমান কবির পক্ষেও এই যোগসূত্র ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কবির মধ্যে এই সংস্কার ও বিশ্বাসের জন্মলাভের মূল কথাই হল আশংকা ও কামনা। আর পাঁচ জনের মতো কবির নশ্বর জীবনে আশংকার কারণ প্রতিপদে। মৃত্যুভয় মানব জীবনের সবচেয়ে বড় ভয়। দুর্বিপাক এবং দুর্ঘটনার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার এবং এ বাবদে কিছু পথ নির্ধারণ এবং প্রতিকারের ভাবনায় কবি যে শুধু মাত্র আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক পথ অনুসরণ করবেন তা নয়। কবির ইচ্ছাশক্তিই যখন কবিকে পরিচালিত করে, তখন এই will force নিরন্তন যাদুদণ্ড বুলিয়ে ধাতস্থ রাখে কবিকে। তিনি আজীবন ইচ্ছাশক্তি নামে ম্যাজিকের বশীভূত হয়ে কাব্যে তাঁর মানস-অধিকার বিস্তার করেন। এই প্রক্রিয়ায় কবি যদি লোক সংস্কৃতির নানা উপাদানকে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেন তবে সেই বিষয়মুখতাই হয় তাঁর কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। শুধুই কবিতা লেখার জন্য পাতা ভরিয়ে যান অথবা কবিতার নামে যাঁরা বহু প্রসবিনী, সেই সব অসচেতন কবিদের কথা অবশ্য আলাদা। বিষয়মুখীতা বা সাবজেকটিভিটি সচেতন কবির কবিতাগুলিকে ধরা-ছোঁয়ার বাস্তবতায় নিয়ে আসে অত্যন্ত সাবলীল ভাবেই। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের দু'বাংলার কবিদের অনেকেই এই বাস্তবতার কারণেই তাঁদের কবিতায় আটপৌরে জীবনকে সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছেন। ফলে কবিতা পাঠের রম্য অনুভূতি কবিকে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কবিতার সব পংক্তি নয়, এমন কিছু পংক্তি তাঁরা চয়ন করেছেন, যে গুলিতে সৎ ও নিষ্ঠাবান কবির যাবতীয় বাস্তব অভিজ্ঞতার কাব্যিক উন্মোচন ঘটেছে। এই উন্মোচন আসলে আত্ম উন্মোচন, আত্মকথন মাত্র নয়।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় লোক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। গ্রাম-বাংলার মানুষের

মধ্যে বৈজ্ঞানিক বোধ ও বুদ্ধির আপেক্ষিক স্বল্পতা তাদের সহজেই আশঙ্কা ও কামনা জনিত সংস্কারের পদপ্রান্তে বিশ্বাসের অর্ঘ নিবেদন করতে বাধ্য করে। কোন বিশেষ রোগে কোন বিশেষ দেবীর পূজা করা, বিশেষ বার ও তিথিতে বিশেষ ফল খেলে সে বছরের জন্য সর্পাঘাত থেকে মুক্তি পাওয়া, আবার সেই রকম কোন মাসের কোন দিনে বনে-জঙ্গলে গিয়ে পূজা-পার্বণ করে সন্তান-স্বামী ও পরিবারের মঙ্গল কামনা বা দীর্ঘায়ু কামনা করা আজও কি গ্রামে, কি-শহরে সর্বত্রই বর্তমান। শিক্ষিত মানুষও বিপদের চরম মুহূর্তে কোনো অদৃশ্য শক্তির অনুকরণ এবং সাহায্যে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে। কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি লোক জীবন থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে তা শব্দ ব্যবহারে, বাক্য নির্মাণে বা ধ্বনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাজে লাগান। আহৃত উপাদান মূল কবিতার শরীরে কতটা ও কেমন ভাবে মিশ্রিত হয়ে কাব্য শরীরী হয়ে উঠবে তা বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন কবি স্বয়ং। লোক উপাদানের এই প্রসঙ্গীকরণের ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে বিপ্লব চক্রবর্তী বলেন, 'প্রসঙ্গীকরণ হল কোনো উপাদানকে মূল প্রসঙ্গের অঙ্গীভূত করা। কবিতার অর্থ উপলব্ধির জন্য অথবা মর্মোপলব্ধির জন্য মূল বিষয়টি কি, তা বোঝা প্রয়োজন। মূল প্রসঙ্গের অন্তর্গত প্রসঙ্গের তাৎপর্যও তখন বোঝা যাবে। ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে যে অনিবার্য যোগাযোগ বর্তমান, তার ভিত্তিতেই এই প্রসঙ্গীকরণ অর্থাৎ প্রসঙ্গের অন্তর্গত প্রসঙ্গের ব্যবহার ঘটে। এখানে কবিতায় প্রযুক্ত প্রসঙ্গ, বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'দূরে অশথ তলায় /পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায় / বাউল দাঁড়িয়ে কেন আর ? / সামনে আঙিনাতে / তোমার একতারাটি হাতে / তুমি সুর লাগিয়ে নাচো।' - তখন বাংলার লোক সংস্কৃতির এক বিশেষ প্রসঙ্গই মূর্ত হয়। বাউল-জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে যে পাঠক জানে না, তার কাছে এক কবিতার অর্থ বোধগম্য হবে না।'[২] এই লোকোপাদান অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বিভিন্ন কবির কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর হতাশা, ভারতীয় জনমানসে রাজনৈতিক মুক্তির আকুলতা ও সঠিক পথনির্দেশের অভাবে অস্থিরতা, ঔপনিবেশিক ক্রুর প্রবঞ্চনা ও ভেদবুদ্ধি সঞ্জাত

সাম্প্রদায়িকতার নগ্নতা এবং সর্বোপরি বৌদ্ধিক আন্দোলনের লক্ষে অস্বচ্ছতা প্রভৃতি অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে বাংলা সাহিত্যে কবিদের উদয় ঘটেছিল। এঁদের অনেকের মধ্যেই ছিল দেশজ প্রেক্ষাপটে কাব্য সৃষ্টির প্রয়াস। বলা বাহুল্য, এদেশের জল-হাওয়ায় সৃষ্ট, লালিত, ঐতিহ্য-চেতনায় উদীপ্ত এবং এদেশের মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত, যার দীর্ঘ মূল মাটির গভীরে প্রোথিত-তা এই সব কবিদের কাব্যে ও জীবন চর্চায় ক্রিয়াশীল ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সমকালের বিশ্বজোড়া আর্থ-সামাজিক জটিলতার প্রক্ষেপ, দেশ-জাতি-ধর্ম বিষয়ক চেতনার বৌদ্ধিক সংঘাত। কাব্য সৃষ্টির এই নাজুক প্রেক্ষাপটই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিদের কাব্য সাধনার প্রেক্ষিত।

এই প্রেক্ষিতেই কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত লেখেন -

১. গ্রাম বালিকার অনায়াস উলু দেয়া
জলে খই ভাসানোর অবাধরীতিতে
সরলতা এনেছিল ভারি অকপট।
রেশমি কাঁচের লালনীল চুড়ি, সুতোর আসন
ভাসান ভাসান সারাবেলা। [৩]

২. যেদিকে তাকাই শুধু বাংলা দেশ।
আমার স্বপ্নের খিল খিল পদ্মা
বয়ে আনে পিনিশ, সালতি-ভরা রূপালি ইলিশ
আবহমানের বাংলা দেশ। [৪]

৩. কৈবর্তের জাল-ফেরা দাওয়ার ওপর
সে শুয়ে রয়েছেমাজা, চকচকে ইলিশের আঁশে
গোহালে ধুনোর ঝিম-ধরা গন্ধে
ত্রিনাথের মেলায় বাউল-মুর্শেদের
লোক-বিভঙ্গের ঠামে,

উজ্জ্বল শষ্যের ধারে শান পরা হাঁসুয়ার
শব্দ করো নাকো। [৫]

৪. কাগজের শিকলি কেটে পুজো-আচ্চার মতো
একতালে খুবই আয়োজন-টায়োজন ছিল আমার।
এক কেজি ব্যাসন কিনে
এন্তার কুমড়ো ফুল ভাজা হত
মৌরলা মাছের টক রাঁধত বৌ। [৬]

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এমন অনেক কবির উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁরা তাঁদের কবিতায় চিত্রিত করেছেন মানব সমাজের অতি সাধারণ নর-নারীর কথা যাঁদের মধ্যে তথাকথিত সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে ঐতিহ্যমুখী জীবনব্যবস্থা, চালচলন, রীতি-নীতি, চিন্তাধারা প্রভৃতিকে বদলিয়ে দেয় নি অথবা 'সভ্যতার আলোক' প্রবেশ করলেও সেই সমজের কাঠামো মূলত 'ট্রাডিশন' বা ঐতিহ্যের পটভূমিকায় বিদ্যমান। এই অর্থের দিকেই লক্ষ রেখে আলোচ্য অধ্যায়ে নিঃসংকোচে Folk অর্থে 'লোক' শব্দটি ব্যবহার করেছি। এরই প্রায়-সমার্থক দুটি শব্দ আছে - ' জন' এবং 'গণ'। কিন্তু এই দুটো শব্দই ইংরেজি People শব্দটির দিকে ইঙ্গিত করে এবং একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি-নির্ভর শ্রেণির কথাই মনে করিয়ে দেয়, যে শ্রেণি সমাজে নির্যাতিত এবং শোষিত। আমরা যখন গণসাহিত্য, গণনেতা, জনশক্তি, জনকণ্ঠ প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে নিজস্ব ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবিতে আন্দোলনকরি তখন জনসাধারণের কথাই আমাদের মনে উদিত হয়। অন্যপক্ষে Folk অর্থে লোক, যেমন উচ্চারণের দিক থেকে, তেমনি অর্থের দিক থেকেও বিশেষ উপযোগী। সুতরাং Folk অর্থে 'লোক' শব্দটির ব্যবহারে কারো কোনো আপত্তি থাকবার কথা নয়।

অন্ত্যলগ্ন বিশশতকের বাঙালি কবিরা Folk অর্থে 'লোক' শব্দটি নিঃসংকোচে মেনে নিয়েছেন। Folk - এর সাথে যুক্ত হয়েছে Lore প্রাচীন ইংরেজিতে শব্দটি ছিল Lar, ডাচ্ ভাষায় Leer এবং জার্মান ভাষায় Lehre - শব্দটির মূল উৎস প্রাচীন টিউটনিক ভাষায় বিদ্যমান, যার অর্থ জ্ঞান দান বা আহরণ করা। পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থ বিন্যাসে পরিবর্তন

ঘটে - প্রাচীন বিশ্বাস, কাহিনি বা ঐতিহ্যগত শিক্ষা প্রভৃতিকে বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হলেও ধীরে ধীরে এর প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় Wisdom of the folk. ফোকলোর শব্দটিকে অনেকে বাংলায় লোকলোর হিসেবে ব্যবহার করেন। এর নিম্নলিখিত উপাদান বা উপকরণ অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিরা তাঁদের কবিতায় ব্যবহার করেছেন বলে আলোচ্য অধ্যায়ে এর আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলে আমাদের মনে হয়।

প্রাচীন ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে যে সমাজ এখনো দাঁড়িয়ে আছে- যাঁদের ঠিক Primitive বলা যায় না অথচ যাদের সমাজিক রীতি নীতিতে ও চাল চলনে প্রাচীনতার ধারা প্রবহমান সেই সমাজকে জনসাধারণের সমাজ বলে মেনে নিয়ে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিরা তাদের কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন লৌকিক সংস্কৃতির অধিকারী মানবগোষ্ঠীর ঐতিহ্যমুখী জীবন ব্যবস্থা, চালচলন, রীতিনীতি, চিন্তাধারা প্রভৃতি। তাঁদের কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে ফোকলোরের সেই উপাদান যা কালের প্রবাহকে অতিক্রম করে জীবিত রয়েছে এবং বর্তমান কালের অন্যরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নি। লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যগত দিক অর্থাৎ বিশ্বাস, আচারব্যবহার, সাহিত্য, শিল্প, জীবন যাপনের জন্য উদ্ভাবিত বস্তু প্রভৃতি, যেগুলির পিছনে আছে সৃষ্টির স্পর্শ, যা কালকে অতিক্রম করে মানুষের জীবনকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করছে, তাদের আনন্দ বিধান করছে সেই উপাদান গুলোই হয়েছে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক বাঙালি কবির কাব্যের উপকরণ। তাঁরা শুধু ফোকলোর বলতে লোক সাহিত্যকেই বোঝেননি, লোক কাহিনি, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকগীতিকা, লোকসংগীত, লোক কবিতা প্রভৃতির পাশাপাশি এনেছেন ধর্ম, মুখে মুখে সৃজিত এবং মুখে মুখে স্থিতিশীলতা প্রাপ্ত আচার ব্যবহার, শিক্ষা, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। বস্তু-নির্মাণ পদ্ধতি যা গ্রাম্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয় যেমন- লাঙল, জোয়াল, গ্রাম্য ঘর, বেড়া, হাতিয়ার , লোকশকট প্রভৃতি। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা লোকজীবনের কথা বলতে গিয়ে এনেছেন—

১. আচার, ট্যাবুজ, লোকবিশ্বাস, ক্রিয়াকর্ম, সংস্কার, অনুষ্ঠান।

২. লোকধর্ম, লোকখাদ্য, লোকচিকিৎসা পদ্ধতি।

৩. লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকভাস্কর্য।

৪. লোকখেলা-যা বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

৫. লোকবিজ্ঞান ও লোককারিগরী।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা 'লোক' বলতে যা বুঝেছেন তা অনেকটা এই রকম -

১. গ্রামে বাস করলে এবং অশিক্ষিত হলেই তারা লোক, শহরে বাস করলে তারা লোক নয়, শিক্ষিত হলেই তার মধ্যে লোকত্ব অন্তর্হিত হল, এই সব ধারণা ভ্রান্ত। তাদের বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান অথবা বাসস্থানের ভিত্তিতে নয়, লোক বলতে বুঝতে হবে লোকের চরিত্র ও কার্যকলাপ।

২. একমাত্র সচ্ছল আর্থিক বুনিয়াদই সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করেনা। অর্থ সংগতি থাকলেই তিনি অ-লোক, সঙ্গতিহীন মানুষই কেবল লোক তাঁরা এই চিন্তাও সমর্থন করেন না।

৩. সুসংস্কৃতি কথাটি তাঁদের কাছে ভ্রান্ত। যারা 'লোক' তাদেরও সংস্কৃতি আছে, নাম লোক সংস্কৃতি। তাঁদের বিশ্বাস, লোক সংস্কৃতিকে অনগ্রসর সংস্কৃতি বলা চলে না। তারও একটা নিজস্ব শক্তি আছে, প্যাটার্ন আছে, এমন কি হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে তা নাগরিক সংস্কৃতির চেয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা এ বিষয়ে সুস্থির যে লোক সংস্কৃতি একটি দেশের বৃহত্তর সংস্কৃতিরই অঙ্গ--- তা অনগ্রসরও নয়, অপাংক্তেয়ও নয়।

আলোচ্য গবেষণা পত্রে আমরা এমন কিছু কবিকে বেছে নিয়েছি যাঁরা -

১. অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবি।

২. এপার-ওপার বাংলায় কাব্যজাল বিস্তার করেছেন।

৩. বাংলা চলিত ভাষায় কাব্য রচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

৪. লোক সংস্কৃতির নানা উপাদান গ্রহণ করেছেন কাব্যে।

যেমন-

১. প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, লোকসংগীত, ছড়া, লোকাশীর্বাদ, লোকবিশ্বাস, লোকোপমা, লোকখেতাব, লোকমন্ত্র, লোককৌতুক, শুভ সম্বোধন, পাখির ডাক ইত্যাদি।

২. লোকবিশ্বাস, লোকাচার, লোকানুষ্ঠান, সংস্কার, শাস্ত্রীয় রীতিনীতি, লোকোৎসব,ঐতিহ্যিক ক্রিয়াকর্ম।

৩. লোকখেলা, পশুপাখির মধ্যে প্রতিযোগিতা।

৪. লোকনৃত্য, লোকনাটক, লোকানুকরণ, লোক অঙ্গভঙ্গি, শারীরিক সংকেত।

৫. লোকচিত্র-শিল্প, লোক প্রতীক, লোকপুতুল, লোকপ্রতিমা, আলপনা, পিঠা ও তার ডিজাইন, লোক অলংকার, লোকপোষাক, ঐতিহ্যিক স্বস্তিকা ইত্যাদি।

৬. লোক চিকিৎসা, লোক ওষুধ, লোক খাদ্য, বৃক্ষ-রক্ষা ইত্যাদি।

৭. লোক কারিগরি-যেমন লাঙল, জোয়াল, মই, কাস্তে, লোকজাল, লোকশকট, লোকপাত্র, লোকরন্ধন, লোকবয়ন শিল্প।

কবিদের ব্যবহৃত এই সব বস্তুভিত্তিক লোক উপাদান গুলি প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিখ্যাত লোকরিক্‌থাবিদ আর্চার টেলর এর সেই উক্তি যার মধ্যে নানা লোক উপকরণ বিদ্যমান -

Folklore is the material that is handed on tradition, either by word of mouth or by custom and practice. It may be folksongs, folktales, riddles, proverbs or other materials preserved in words. It may be traditional tools and physical objects like fences or knots, hot cross buns or easter eggs; traditional ornamentation like the walls of troy; or traditional symbols like the swastika. It may be traditional procedures like throwing salt over ones shoulder or knocking on woods. It may be traditional beliefs like the notion that elder is good for ailments of the eye. All these are folklore."

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক বাঙালি কবিই এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে একটা জাতি, গোষ্ঠী বা অঞ্চলের জন জীবনসম্পর্কে জানতে হলে তার লোকসংস্কৃতিই

অন্যতম মাধ্যম। কেননা প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠী বা অঞ্চলের চালচিত্রের মধ্যেই নিহিত তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যা প্রতিফলিত হয় তার লোকসংস্কৃতিতে। আরও একটি বিষয়ে তাঁদের অনেকেই সচেতন ছিলেন যে এদেশে সাধারণ ভাবে ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংরক্ষণের প্রবণতা তেমন একটা না থাকায় লোকসংস্কৃতির উপর নির্ভর না করে উপায় নেই। ধর্মানন্দ দামোদর কোশাম্বীর মতামতকে সমর্থন জানিয়ে তাঁরা যে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেটি হল, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক কাহিনি গুলোতে, প্রবাদ, প্রবচন, কিংবদন্তিতে ইতিহাসের যে সমস্ত উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলোকে ব্যবহার করা সমীচীন। যেহেতু লোকসংস্কৃতি একটি জাতির দর্পণ ও প্রাণস্পন্দন তাই এই সংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে একটি জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের মন্থর ইতিহাস। আমাদের সভ্যতার ইতিহাস প্রথমে গ্রামজীবনে বিকশিত হয়েছে এবং পরে তা নানাবিধ প্রয়োজনে শহর জীবনে প্রবেশ করেছে। এতে সবচেয়ে বড় যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা হল এই যে বর্তমান সভ্যতায় শহুরে প্রকোপ আমাদের চেতনাকে করেছে অতীত বিস্মৃত এবং নির্মমভাবে উদাসীন। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক বাঙালি কবি-মন তাই শেকড় সন্ধানী হয়ে শুধু লোক ঐতিহ্যের খোঁজে ব্যস্ত থাকেনি, ফসল ফলাতেও তৎপর হয়েছে। কবিরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের চারপাশের জীবনের নানা জটিলতা, ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে জীবন সংগ্রামও জটিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান। অথচ গ্রামীন সমাজেও আছে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, জয়-পরাজয় আবার শপথের জেদী ও অহংকারী তেজ,বীর্য ও উচ্চারণ, নতুন করে শুরু করার অঙ্গীকার, সবকিছু। আছে প্রেম, ভালোবাসা, দুঃখ-বিরহ, সমগ্র জীবন-যন্ত্রণা, জীবনানুভূতি। এই সব অনুভূতির প্রকাশভঙ্গিও অনেক সহজ-সরল, অনেক প্রাণের কাছাকাছি। জীবনের রক্ত-অশ্রু-স্বেদ মিলিয়ে তার স্বাদ নোনা, সেখানে মাটির সোঁদা গন্ধ, জীবনের গনগনে উত্তাপও বর্তমান। সংগ্রামের ঋজুতা ও দৃঢ়তাও সেখানে সমান্তরালভাবে সাবলীল। তাই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিদের অনেকেই লোক সংস্কৃতির উপাদান-উপকরণকে জরুরী বলে মনে করেছেন এবং তাঁরা তাঁদের কাব্যে লোক-সংস্কৃতির নানা দিক কমবেশি উপস্থাপিত করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়,

শঙ্খ ঘোষ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মনের গহনে যে স্রোতোধারা বয়ে চলেছে তার পিছনে আছে লোক জীবনের স্মৃতি-বিস্মৃতি।' অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমরা আরও কয়েকটি কথা যুক্ত করতে আগ্রহী। বাংলার বুকে এমন অসংখ্য কবি জন্মেছেন যাঁদের কবি-চেতনায় কাজ করেছে লোক জীবনের আদিমতম বিশ্বাস, চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ, ভয়ভীতি, বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যাকুলতা, ধর্মীয় চেতনা, জৈবিক আবেদন, মানসিক উত্তেজনা ও উদ্বেগ, হৃদয় বৃত্তির আরও নানা দিক।

জাদু, ব্রত, মন্ত্র ইত্যাদি লোকসংস্কার থেকে আহৃত উপাদান, শিব ঠাকুরের তিন কন্যে বিয়ে,
সাত ভাই চম্পা আর পারুল বোন, যুগ যুগান্ত ধরে প্রজ্জ্বলিত রাবণের চিতা, নকশি কাঁথা, হাতি-ঘোড়া-পালকি, গোল্লাছুট, কাকের পাল, গোয়াল ঘর, নবান্ন, হলুদ ধান, গুণিনের বাণ, লক্ষীসরা, খড়ের চালায় লাউডগা, তুলসীমঞ্চ, রাস উৎসব, বেহুলার ভেলা, কৌটোয় লুকোনো ভোমরা, বাউলগান, সংক্রান্তির মেলা, ইস্টকুটুম, গুগলি-শামুক, ব্রত পালন, গাজনের ভিড়, ডুগডুগি, যমুনাবতী-সরস্বতী – লোকসংস্কৃতির এরকম নানা অনুষঙ্গ ব্যবহার করে কবিরা পাঠককে এনে ফেলেন অতীত ও বর্তমান, চেতনা ও অধিচেতনার এক মিলন বিন্দুতে। 'লোক ঐতিহ্য নির্ভর করে যখন কবিতা লেখা হয়, তখন কবি ও পাঠকের একটা মিলন ভূমি রচিত হয়। ঐতিহ্য শুধুমাত্র অতীত নয়, তার মধ্যে একটা বহমানতা আছে। কবি ও পাঠকের অধিচেতনায় ছড়িয়ে থাকা লোকঐতিহ্য যখন কবিতার মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন উভয়ের একাত্মবোধের ভিত্তি রচিত হয়। লোকঐতিহ্য অন্তঃশীল ধারায় বহমান। সংস্কৃতির গভীরে তার অবস্থান। কবি যখন দেশীয় লোক ঐতিহ্যেকে নির্ভর করে কবিতা লেখেন, তখন ঐতিহ্যের নির্যাস রূপটুকু ফুটে ওঠে।'[৮]

উপরের কথাগুলির সাথে মিল খুঁজে পাই কবি শঙ্খ ঘোষের বক্তব্যে, 'ঐতিহ্য যেমন নির্যাসরূপ, তেমনি কবির অস্তিত্বে সে বহমান থাকে কেবল প্রচ্ছন্ন চরিত্রে, তাঁর মজ্জার মধ্যে তখন তাঁর ছন্দে শব্দে প্রতিমায়, কবিতার সামগ্রিক স্বভাবেই এমন একটা টান তৈরি হয় যা কখনোই আমাদের শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রচ্যুত হতে দেয় না, কবি তাঁর

পাঠকের সঙ্গে মিলন ভূমি পেয়ে যান সেইখানে।'[৯]

বলা বাহুল্য, 'লোক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট' লোক সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে লোক সংস্কৃতির বিষয়-বৃত্তান্ত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই আমাদের প্রত্যয়।

'সংস্কৃতি' শব্দটি বয়সে অতি নবীন। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও বাংলা শব্দ হিশেবে 'সংস্কৃতি' কেউ ব্যবহার করেছেন কিনা সন্দেহ। এই সন্দেহের কথা সোচ্চারে উচ্চারণ করেছেন ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থে। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত 'Culture' এর প্রতিশব্দ হিশেবে ব্যবহৃত হতো 'কৃষ্টি' শব্দটি। 'কৃষ্টির মূলগত অর্থ 'কর্ষণ-কার্য'। চাষ অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়, Culture অর্থে নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দটিকে গতানুগতিক ভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু শব্দটি সম্বন্ধে তাঁর অস্বস্তি ছিল। ১৯২২ সালে সুনীতি কুমার প্যারিসে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর একটি মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুকে Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করতে শুনে সুনীতি কুমারের খুবই মনে ধরে শব্দটি এবং বাংলা শব্দের জগতে একটি নতুন শব্দের সংযুক্তি -সম্ভাবনার কথা ভেবে তিনি আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। এমন উচ্ছ্বাস দর্শনে বিস্মিত সুনীতি কুমারের বন্ধু জানান, Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে মারাঠি ভাষায় 'সংস্কৃতি' শব্দ বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৯২২ সালেই সুনীতি কুমার দেশে ফিরে এসে Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যবহার 'কৃষ্টি' শব্দের চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। যদিও তারপরেও দীর্ঘ বছর 'সংস্কৃতি'র চেয়ে 'কৃষ্টি' শব্দটি বাংলা ভাষার বেশি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। আজ কিন্তু 'কৃষ্টি'র সেই সুদিন আর নেই। কৃষ্টির জায়গা দখল করেছে 'সংস্কৃতি'।

এতো গেল 'সংস্কৃতি' শব্দের বাংলা জগতে প্রবেশের বৃত্তান্ত। বিগত কয়েক

বছরের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাব, 'সংস্কৃতি' শব্দটি আজ নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাংলা শব্দ জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। তবু এর পরেও সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, যতই ব্যবহৃত হতে হতে সংস্কৃতি শব্দটি জনবল্লভতা লাভ করুক না কেন, শব্দটির প্রকৃত অর্থ আজও এক আজব ঘেরাটোপে বন্দী হয়েই রয়েছে। সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি, জাতীয়সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক সংস্থা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি শব্দ গুলোর সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া বাঙালিরা যতটা পরিচিত, সম্ভবত প্রায় ততটাই এই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ তাঁদের কাছে অ-ধরাই থেকে গেছে। সাধারণ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা 'সংস্কৃতিবান' বলতে সমাজের সেই সব মানুষকেই চিহ্নিত করেন, যাঁরা সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, নাট্যকলা, নৃত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি কোনো এক বা একাধিক বিষয়ে জানেন বা বোঝেন অথবা সেই ধরণের চারুকলার কোনও একটি বিষয়ের সঙ্গে নিজের কর্ম জীবন জড়িয়ে গেছে জীবনের শ্বাস প্রশ্বাসের মতোই। আবার যাঁরা ঘর সাজাতে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেন বাঁকুড়া কি গোয়ার পোড়া মাটির কাজ, মধুবণীর চিত্রকলা, ডোকরার মূর্তি, পটের ছবি, ছৌ-নৃত্যের মুখোস বা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর অথবা ভাস্করের চিত্র বা মূর্তি, তাঁদের ওপর 'সংস্কৃতিবান'-এর তকমা সেঁটে দিই আমরা। সমাজের একটি শ্রেণিকে আমরা যেমন এই ধরণের বিচারের মাধ্যমে 'সংস্কৃতিবান' হিশেবে চিহ্নিত করি, একই ভাবে সমাজের আর এক শ্রেণিকে অসংস্কৃত মানুষ হিশেবে চিহ্নিত করে তাঁদের রুচিকে অমার্জিত বলে বোঝাতে চাই। কিন্তু কিছু মানুষ সংস্কৃতি সম্পন্ন এবং কিছু মানুষের সংস্কৃতি নেই- এই ধারণাটি প্রচলিত হলেও ভ্রান্ত। লোকসংস্কৃতির এই প্রেক্ষাপটে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিদের কাব্যে লোক-ঐতিহ্যের প্রাণলোক নির্মাণের প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

লোক- ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বাংলার জাগ্রত গণমানসের কথা অনিবার্য ভাবে এসে যায়। সতত প্রবহমান নদ-নদী আর সজীব শ্যামালিমায় ঘেরা, আউল-বাউল, পীর-পয়গম্বর ও মাতৃভক্ত অগণিত সন্তানের দেশ বাংলাদেশ। বাংলার 'চিলমন' রন্ধনে নয়, পারস্পরিক ভাব বিতরণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই খুঁজে পেতে চায় মুক্তির

ঠিকানা। এই দেশের প্রতিটি মানুষের মন ও মানসিকতা যেন এক, ভাষা এক, চলন বলন এক এবং একই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এদের বসবাস। এই সহজাত সংস্কারের বলয়ের বাইরে নন বলেই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিরা তাঁদের নানা বিচিত্র কুতুহলী কবিতায় আমাদের মনে বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব কৌম পরিচয়ের অন্তঃশীল বহুচারিতাকে চিহ্নিত ও শিল্পিত করে গেছেন। লোকজ বাংলার দেশকাল সমাজ ও সংস্কৃতির অন্দরমহল আলোচ্য কবিদের ক্রান্তদর্শী দিশায় আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও দৃষ্টিকোনের ভ্রান্তি আর ঘোর কাটিয়ে প্রকৃত দেশজ অবলোকনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব এই সব কবিরা উপলব্ধি করেছিলেন। এঁদের অনেকের কবিতাই লোকায়তের পুনর্নির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ। তথ্য ও সমাজ সত্যের সমাবেশেও অনেক কবিতায় মর্মী মানুষের সন্ধান মেলে। এ যুগের অনেক কবিই বাংলার দেশজ সংস্কৃতির দীর্ঘ চলমান নদীতে মিশে যাওয়া সমাজ ইতিহাস ও লৌকিক বিশ্বাসের গূঢ়চারী স্রোতাবর্তকে অসীম সন্ধানী দক্ষতায় বীক্ষণ করেছেন। ধর্মের বিচিত্র ধারণা, দেশাচার ও লোকাচার, যাদুবিশ্বাস, উর্বরতার চিহ্ন, শষ্যস্বপ্ন ও নারী মানস কাব্যশৈলীতে বিমিশ্রিত হয়েছে। লোকজীবনের কাব্যিক উপস্থাপনায় অনেক কবি সমাজ সত্যের প্রেক্ষাপটে ভাবালুতা ও আবেগকে সংযত করেছেন। লোকসংস্কৃতির যে বড় অংশ ধর্ম— সে প্রসঙ্গে উৎসাহী কবিরা কাব্যকায়া নির্মাণে ব্যবহার করেছেন দেবদেবী, দেববাহন, ব্রত-পুরাণ, ধর্মীয় লোকউৎসব প্রভৃতি। লোকজীবনের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক থাকার দরুণ অনেক কবি প্রকৃতির অঙ্গনে অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং তাঁদের প্রাণে নতুন উদ্দীপনা, নবীন কল্পনার উদয় হয়েছে। লোকজ সংস্কৃতির অনুরাগে অনুরঞ্জিত হওয়ার কারণে অনেক কবি অহমিকা বা অহংভাব থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয় উৎসারিত করেছেন লোকভাবনায়।

জগৎ জুড়ে মানুষ লোকসংস্কারে বিশ্বাস করেই চলেছে। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কার নেই, এমন জাত নেই। লোকসংস্কার শুধু যে অশিক্ষিত লোকসমাজেই প্রচলিত রয়েছে তা নয়, শিক্ষিত ও ভদ্র ব্যক্তিরাও সংস্কার মানেন। এরপরে বলা যাবে না যে লোকসংস্কার থেকে কবিদের অবস্থান দূরে। যন্ত্র-ক্যামেরায় নয়, চোখের ক্যামেরায় কবি লোকজগতের

ছবিকে প্রথমে ধরেন এবং পরে তাকে 'লোকায়ত জীবনের সুরে, লোকাভরণের শৈলীতে' উপস্থাপিত করেন কবিতায়। কবি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় 'অশোক' কবিতায় (শ্রেষ্ঠ কবিতা) যখন বলেন -

'সংক্রান্তির যোগ আজ
আমিও এবার তবে সরাখানি ভাসাই নদীতে।'

তখন লোক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটটি আমাদের বুঝে নিতে হয়। অগ্রহায়নের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত পুরো একমাস ধরে বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ায় চলে টুসু পরবের পূজা ও গান। অগ্রহায়ন মাসে নতুন ধানের তুষ তুলে রাখে মেয়েরা। পৌষের শুরুতে সেই তুষ দিয়ে ভরে তোলা হয় নতুন সরা। সরাটি বিশেষভাবে তৈরি, এখন হাটে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

চালের সাদা গুঁড়োর জলে ডুবানো হয় সরাটি। গায়ে টানা হয় পাঁচ বা সাতটি সিঁদুরের লম্বা দাগ। সরার মধ্যে তুষের সঙ্গে রাখা হয় পাঁচ বা সাতটি গুঁড়ি ও গোবরের গুলি। টুসুর উদ্দেশে এসময় বলা হয়—

নবান্নের ধান ভানি দিনখন করে।
গোবরের গুলি রাখি টুসু মা'র তরে।।

আকন্দ ও গাঁদা ফুলের মালাও রাখা হয় সরায়। নতুন আর একটি মাটির সরা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় রঙিন বিচিত্র সরাটির মুখ। ইনিই হলেন টুসু দেবী। প্রতিদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পর ফুল ও প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করা হয় সরাটিকে। নিবেদন করা হয় ভোগ। নারী জীবনের গোপন ও ব্যক্ত কামনা-বাসনা, দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ ও অভিজ্ঞতা, গ্রাম ও সামাজিক জীবনে চলমান ঘটনা প্রবাহ— সবই কথা ও সুরে নিবেদিত হয় টুসুকে। দেবীর উঁচু আসন ছেড়ে টুসু নেমে আসেন নারীদের মাঝখানে। সখির মতো তাঁদের পাশে বসেন। সহমর্মীর মতো নিজেও অংশ নেন সম্বৎসরের অভিজ্ঞতায়। সমস্ত যুবতীই তখন টুসু হয়ে ওঠেন। এই উৎসব ও পূজার প্রাণশক্তি হল টুসু সংগীত। পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু ভাসান বা বিসর্জনের দিন মেলা বসে নানা জায়গায়। ভাসানের দিন

গানে গানে মুখরিত হয়ে ওঠে মেলার ক্ষেত্র।

'হাসপাতালের দিকে' কবিতায় (শ্রেষ্ঠ কবিতা) চৈতালী চট্টোপাধ্যায় যখন লেখেন -

'বিপত্তারিণীর ব্রত করতাম তখন
আমার থানপরা রোগা দিদিমা
ব্রতকথার শেষে শান্তি জল ছিটিয়ে বলতেন :
'এর পুণ্য ফলে কখনো বিধবা হবি না।'

— তখন বিপত্তারিণী ব্রতকথার লোকজ প্রেক্ষাপটটি জানতে ইচ্ছে করে। বিপত্তারিণী ব্রতে আগের দিন শুদ্ধাচারে থেকে হবিষ্যান্ন আহার করতে হয়। পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি শেষে উত্তর অথবা পূর্ব দিকে মুখ করে আচমন করে স্বস্তিবাচন শেষে সূর্যমন্ত্র পাঠ করে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প নিবেদন করে বিপত্তারিনী দেবীকে তাম্রপাত্র, তিল, হরিতকি, তুলসী, কুন্দ ও দুর্বা নিয়ে সংকল্প করতে হয়। এর পর ঘটস্থাপন, আসন ও পুষ্পশুদ্ধি করে হাতে ফুল নিয়ে ধ্যান করতে হয়। ধ্যানান্তে পুষ্পটি ঘটের উপর স্থাপন করে দেবীকে আহ্বান করতে হয়। বলতে হয়, 'ওঁ, বিপত্তারিনী দুর্গায়ৈ নমঃ।' এরপর দেবীর উদ্দেশ্যে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে পাঁচালী পাঠ বা ব্রত কথা শোনানো হয়। কোথাও কোথাও দেবীর উদ্দেশ্যে তেরো রকমের ফল দিতে হয়। বিপত্তারিনী ব্রতের পাঁচালী পাঠের শুরু এই রকম —

বৈকুণ্ঠ ধামেতে বসি লক্ষ্মী নারায়ণ।
কহিছেন মহাসুখে বিবিধ কথন।।
উপস্থিত হইল তথা দেবর্ষি নারদ।
কহিলেন ধরাধামে বিষম বিপদ।।
কি ব্রত করিলে হয় বিপদ নাশন।
সে তত্ত্ব বুঝিয়ে বল আমারে এখন।।

এরপরে —

লক্ষ্মীদেবী পানে চাহি কহে নারায়ণ।
শুনহ দেবর্ষি সেই ব্রতের কারণ।।

যে ব্রত করিলে সর্ব দুঃখ দূর হবে।
বিপত্তারিনী ব্রত নাম তার ভবে।।
শুদ্ধমতে এই ব্রত করে যেই নারী
সধবা থাকিয়া শেষে যায় স্বর্গপুরী।।

পাঁচালীর শেষ দুই পংক্তির সঙ্গে চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বাক্ত কবিতার কি মিল, 'এর পুণ্য ফলে কখনো বিধবা হবিনা।'

আলমাহমুদ যখন 'খড়ের গম্বুজ' কবিতায় বলেন,

'আমাদেরই লোক তুমি। তোমার বাপের
মারিফতির টান শুনে বাতাস বেহুঁস হয়ে যেত।'
(শ্রেষ্ঠ কবিতা)

তখন মারিফতির প্রেক্ষাপট আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। মূলত চার ধরনের 'একিন'-এর ওপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যথা-বিলগায়েব, আজনূল, ইলমূল, আইনূল।

'একিন' শব্দের অর্থ বিশ্বাস। মানবজীবনে যা কিছু ঘটমান বা ঘটে থাকে তার যেমন দেখে, শুনে, পড়ে বিশ্বাস করার দিক আছে, তেমনি না দেখে, না শুনে শুধুমাত্র অনুভব বা অনুভূতি সমর্থিত হয়ে অতীন্দ্রিয় দর্শন, শ্রবন প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের দিক আছে। যেগুলো সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ বা ধারণার কথা আল্-কোরআন বা হাদিসে নেই তাকে অনুভব করে ঈশ্বরের আত্মসমর্পণ ও ভক্তিযোগের আরাধনা হল 'কেয়াস'। এই 'কেয়াস'- এর আমল করা অর্থাৎ বিশ্বাস ও আচরণ করাই হল ইসলামিয় ধর্ম বিশ্বাস এবং তারই বিশেষ কয়টি শাখা বা সম্প্রদায় হল শরিয়ৎ, মারিফৎ হকিকৎ, নজিহৎ প্রভৃতি।

উপরোক্ত শাখা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি হল 'মারিফৎ'। শরিয়তের পরেই ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে মারিফতের স্থান। আরবি ভাষায় শব্দটি 'মঅ'রফৎ'। অনেকে বলেন 'মায়ারফৎ'। এর থেকেই 'মারিফতি'। মারিফতি সাধকেরা তন্ত্রাচারে বিশ্বাসী। এঁরা মুর্শিদ বা গুরুকে মান্য করেন। এঁদের সাধনা কায়াবদী হলেও লক্ষ্য সেই একেশ্বর

আল্লাহ্‌তা'লা। তাঁকে পাবার মাধ্যম মুর্শিদ বা গুরু। মারিফতি সাধকের রচিত সংগীত হল মারিফতি গীত। এ গানের একটি কলি ঃ

'এই দুনিয়া বানাইয়া আপে সাই কিবরিয়া।
প্রেমের খেলা খেলছে সদায় গোপনে থাকিয়া।''[১০]

'হৃদয়পুর' কবিতায় আল মাহমুদ 'মাষের বড়ির' কথা বলেছেন -

'আমি একটা গঞ্জের দিকে যাচ্ছি টের পেয়েই
আমার স্ত্রী দৌড়ে এসে বাজারের থলিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল,
এক কুড়ি সবুজ কৈ মাছ আর মাষের বড়ি আনতে ভুলোনা।'[১১]
(শ্রেষ্ঠ কবিতা)

মাষকলাইয়ের ডাল বেটে তৈরি হয় 'মাষের বড়ি'। বাঙালির এই প্রিয় খাদ্যটির উদ্ভব এক বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলে। এক কালে 'বড়ি দেওয়া'র ব্যাপারটি ছিল লোক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ দিনে তিথি-ক্ষণ দেখে বড়ি, কাসুন্দি, আমসত্ত্ব, আচার প্রভৃতি তৈরির রেওয়াজ এখন কমে এসেছে। পরিস্কার চাটাইয়ের ওপর বড়ি দেবার সময় প্রথমে সিঁদুর-দুর্বা দিয়ে দুটি বড় আকারের বড়িকে 'বরণ' করা হত। বলা হত 'বুড়ো-বুড়ি বরণ'। কিন্তু গুহাবাসী মানুষতো এ কাজটি প্রাগৈতিহাসিক যুগে করেনি। খাদ্যাভ্যাসের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ 'মাষের বড়ি' আমাদের কাছে এত প্রিয়। মানব সমাজে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি। মানুষ তার দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ও অনুধ্যানের মাধ্যমে জীবনের পথে যে সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে থাকে তাদের কার্যকর প্রয়োগ বা ব্যবহারিক প্রয়োগ সার্থকতায় পর্যবসিত হলে সামগ্রিক জীবনধারায় পরিবর্তন আসে। স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিবর্তন সুদূর প্রসারী এবং সেটি জনজীবনের ছন্দকে উদ্দীপিত করে, সঞ্জীবিত করে এবং সর্বোপরি গভীরতর ধারায় নিজেকে নিবদ্ধ করে যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সেই পরিবর্তনের ফল লাভ করে জীবনকে স্বচ্ছন্দ করে তুলতে পারে। 'মাষের বড়ি' হল এক বিশেষ সময়ের খাদ্য উৎপাদন কৌশলের মনোহারী আবিষ্কার, আর এর পেছনে রয়েছে লোক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট।

কবি নির্মল হালদার 'খোলামকুচি' কবিতায় 'রামায়ণ গান'-এর প্রসঙ্গ এনেছেন -

'আমাদের মহল্লায় রামায়ণ গান হয় ।
রাত আটটা বাজতেই নানা বয়সের
পুরুষ ও মহিলা এসে জড়ো হয়,
ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরাও
কিচির মিচির করে ।'

(শ্রেষ্ঠ কবিতা/পৃ ৭৭)

লোজীবনযাত্রায় সংগীত বিশেষভাবে অর্থবহই শুধু নয়, জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ । মানবমনেই সংগীতের আবেদন । বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের যা কিছু মনকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত করে সংগীত তাদের মধ্যে অন্যতম । সংগীতবিহীন জীবন নিরর্থক । সংগীতে মানব মনের জাগরণ ঘটে, চেতনার উন্মেষ হয়, মানুষকে এক উন্নত লোকে নিয়ে যায় । রামায়ণের কাহিনি সংগীতের মাধ্যমেই সাধারণত প্রকাশ করা হয়ে থাকে, সংগীতের ভাষাকে অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্য দ্বারা জীবন্ত করে রাখা হয় । রামায়ণের কতকগুলো করুণ ঘটনা যেমন রামের বনবাস যাত্রা, সীতা হরণ, রামের বিলাপ ইত্যাদি রামায়ণের গানের মধ্য দিয়ে এমন সার্থক ভাবে প্রকাশ পায় যে তাতে করুণ রস আরো নিবিড় হয়ে ওঠে । কবি নির্মল হালদার লোকঐতিহ্য বিষয়ে সচেতন বলেই তাঁর অনুরাগ দীপ্ত জীবন প্রীতির আত্মিক রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে উপরোক্ত কবিতায় ।

কবি সুব্রত রুদ্র 'বুড়ির ঘর' কবিতার এক জায়গায় যখন লেখেন ——

'দোলের দু তিন দিন আগে থেকে বলছে
শুকনো ডালপালা জোগাড় কর
আজ আমাদের নেড়া পোড়া
বুড়ির ঘরের কাঠমো তৈরী ।'

(দেশ, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯)

তখন লোক-ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলে যায় । 'বুড়ির ঘর পোড়ানো' কবিতাটির সাথে দোলযাত্রার গভীর যোগ রয়েছে । এটি একটি বহ্ন্যুৎসব । এর লোকজ নাম 'মেড়া পোড়া'

বা 'নেড়া পোড়া' । বৈষ্ণব ভক্ত সমাজে এর নাম চাঁচর । প্রথমে শুকনো ডালপালা, লতাপাতা, বাঁশের টুকরো দিয়ে একটি ছোট কুঁড়ে ঘর তৈরি করা হয় । বসত বাড়ির অনতিদূরে এই গৃহে আগুন লাগিয়ে বহ্ন্যুৎসব করা হয় । কোথাও কোথাও পৌষ-সংক্রান্তির দিন এই জাতীয় অগ্নি-উৎসব পালিত হয়ে থাকে ।

'সংস্কৃতি' একটি বিচিত্র এবং জটিল শব্দ । কেবল শব্দই নয়, এটি একটি বিশিষ্ট 'চেতনা' -যে চেতনার সূত্রপাত ঘটেছিল সুদূর প্রাগৈতিহাসিক মানুষের গুহাভ্যন্তরে । একে নানা সময়ে, নানাভাবে বিভিন্ন বিষয়ের আঙ্গিনা থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং আপন আপন উদ্যম ও বিশ্লেষিত ধারণা অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়েছে । একথা অনস্বীকার্য যে বিশ্লেষণ ধারা ও প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে বিভিন্নতা এবং কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী প্রত্যয় দেখা দেওয়ার ফলে সংস্কৃতির উপলব্ধি বিষয়ে বিভিন্ন বিদ্যাশাখার প্রাজ্ঞজন, গবেষক এবং আলোচকদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে । কারণ, দেখা গেছে যে সংস্কৃতির সংজ্ঞার ক্ষেত্রটি অসীমের অধিকারে । উনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকের শুরুতেই সংস্কৃতির বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা দানের প্রচেষ্টার শুরু এবং বিশ্ব অধিবিদ্যা মহলে সেই সংজ্ঞা সর্বজন স্বীকৃত হলেও সংস্কৃতি শব্দটির অন্তর্নিহিত বিশালতা এবং গভীরত্ব একটি বিশেষ সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে দেয়নি । এই কারণে পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃতির অসংখ্য বিজ্ঞান ভিত্তিক সংজ্ঞার উদ্ভব হতে থাকে । বিভিন্ন পরিস্থিতির উপলব্ধির বৈষম্যই নানাধরণের সংজ্ঞাদান কার্যটিকে প্ররোচিত করেছে ।

সংস্কৃতি মানব জীবনের গতিশীল মূর্চ্ছণা । এই গতি অবাধ এবং অপ্রতিরোধ্য । সংস্কৃতি সব সময়েই আদান-প্রদানের ধারায় বিবর্তিত হয় । সংস্কৃতি একদিকে যেমন গতিময় ও প্রাণবন্ত, অন্যদিকে তেমনি সতত পরিবর্তনশীল । মানবজীবনের সঙ্গে সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত । অন্যান্য প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষকে এই সংস্কৃতিই একটি বিশিষ্টতা দান করেছে । মানুষের পরিচয় যে সে এক সাংস্কৃতিক প্রাণী । লোকসংস্কৃতি এই বহুবিস্তৃত সংস্কৃতির দিগন্তেরই একটি অংশবিশেষ । যেহেতু সাধারণ জনজীবনের ধারায় এক বিশেষ ধরণের সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছে এবং দেশজ চিন্তাধারা ও মানসিকতার প্রতিফলন এই সাংস্কৃতিক চেতনার মধ্যে পরিশীলিত হয়েছে সেই হেতু একে আমরা

লোকসংস্কৃতি হিশেবে চিহ্নিত করেছি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমরা বিশেষভাবে মনে রাখব যে গ্রামের অধিকাংশ সাধারণ মানুষই লোকসংস্কৃতির একমাত্র ধারক ও বাহক নয়, প্রধান ধারক-বাহক। লোকসংস্কৃতির উন্মেষ সৃষ্টিকারী লোকেরা যে একশোভাগ গ্রামবাসী হবেন অথবা তাঁরা নিপীড়িত-বঞ্চিত-শোষিত হবেন এমন কোনো কথা নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে থেকেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব এবং বাংলা তথা ভারতীয় জনজীবনে সামগ্রিক ভাবেই এর মিলন ঘটেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে ভারতীয় জনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ গ্রামবাসী ছাড়া আরও এক বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা সাধারণ লোকদৃষ্টির আড়ালে দূর-দূরান্তের প্রান্তসীমায়, কখনো বা অরণ্যাণীর গহন কোনে বিশেষ ধরণের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আজও জীবনধারা নির্বাহ করে চলেছে। এরা আদিবাসী এবং এদের জীবনধারা ও ধারণা লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত। লোক সংস্কৃতির উৎস ও আধার অবৈদিক-অনার্য-অস্মার্ত-অপৌরাণিক জনমণ্ডলী। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কোনো শক্তিই এই সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। ফোকলোর মানব চেতনাকে লালন করে এবং মানবদেহের অনু-পরমানুর মধ্যে তা স্বকীয়তা অর্জন করে।

লোকসংস্কৃতির মৃত্যু হয় না; সে পরিবর্তিত হয়, বিবর্তিত হয়, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। আমরা বাইরে থেকে দেখে মনে করি যে লোকসংস্কৃতির কোনো এক উপাদানের লয় ঘটেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে বহুপূর্বে প্রচলিত এবং বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা বর্তমানের সমাজ মানসিকতায় অর্থহীন হলেও তা সুপ্তভাবে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিরাজ করেছে। আমাদের জীবনচক্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো পর্যালোচনা করলে একথা সহজেই প্রতীয়মান হয়। জন্ম, অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে বহু সাংস্কৃতিকভাব এবং আচরণ সাম্প্রতিক কালের জীবনে অর্থহীন হলেও, এককালে এগুলি বিশেষভাবে অর্থবহ এবং জীবনে অপরিহার্য ছিল। তাই উক্ত ঘটনাগুলির অনুসরণ কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতসারেই সংঘটিত হয়ে চলেছে। 'নৃবিজ্ঞানের ভাষায় এগুলি হল সাংস্কৃতিক জীবাশ্ম।'নৈতিক জীবাশ্ম যেমন বহুবিস্তৃত

জীব অভিব্যক্তির হারিয়ে যাওয়া জৈবশৃঙ্খলটির পুনর্গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক, ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক জীবাশ্মের সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বর্তমানের পরিবর্তিত সংস্কৃতির মূল রূপটির বিষয় উপলব্ধি করতে পারি'।[১১]

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের যে সব কবি তাঁদের কাব্যে লোকসংস্কৃতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে উৎসের প্রতি আনুগত্যের মধ্য দিয়ে দেশজ ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলা বাহুল্য,উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ শেষ পর্যন্ত পরগাছা হয়ে যায়। এই পরগাছা শ্রেণি জীবনধারণের রস সংগ্রহ করে বিজাতীয় কাঠামো থেকে। এই বিজাতীয় কাঠামোটি আসলে কৃত্রিম নাগরিক সংস্কৃতি। এর বিপরীতে লোকসংস্কৃতি প্রধানত গ্রাম ভিত্তিক, যদিও তা একমাত্র নয়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা যখন বাঙালির জাতীয় জীবনের ওপর প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল এবং তারই ফলশ্রুতিতে উঁচুতলার মুষ্টিমেয় বাঙালিকে নিচুতলার বৃহত্তর জনজীবনে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, লৌকিক দেবদেবীকে পৌরাণিক মর্যাদা দিতে হয়েছিল, এমনকি অনেক লৌকিক ধর্মাচরণেরও আর্যীকরণ ঘটেছিল। লোকসংস্কৃতি তাই কোনো স্থির বস্তু নয়, তা যুগ ও কালের সঙ্গে তাল রেখে পালটায়। লোকসাহিত্য, লোকধর্ম এবং লোকশিল্প-এই তিনটি লোকসংস্কৃতির মূল ভিত্তি। এর সাথে সঙ্গত কারণেই জীবন ও জীবিকা যুক্ত। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিরা এটা বুঝেছিলেন। প্রতিটি সময়ের সাহিত্য চিন্তা বিশেষভাবে সেইসময়ের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং শিক্ষিত জনমানসের মানসিকতার স্তরের ওপর নির্ভর করে। আধুনিক বাঙালি কবিদের সাহিত্য চিন্তা অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে এসে লোকঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে একটি সামগ্রিক ইহবাদী দৃষ্টিকোন গ্রহণ করেছিল। এই ইহবাদ একান্ত জড়বাদ নয় কোনো অর্থেই। এই ইহবাদ একটি বাস্তব জীবনমুখী চেতনা। অতিলৌকিক অস্তিত্বের নির্দেশ দ্বারা সেই চেতনা চালিত হয় না, আধ্যাত্মিকতাকে জীবন ধারণের চালক শক্তি বা স্বর্গলাভকে জীবনের সর্বোত্তম অভীষ্ট বলেও মনে করে না। লোক জীবনের শুভৈষাই তার শুদ্ধতম আদর্শ। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিদের মনে পূর্ণ ইহবাদী লোকজীবনবোধ পেয়েছিল লোকঐতিহ্যের যথার্থ প্রেক্ষিত। তাই তাঁদের কবিতায় উঠে এসেছে গ্রামবাংলা। অঞ্চলভেদে বর্ণিত পল্লীচিত্রগুলিতে

কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। কবিদের বর্ণিত লোকজীবন প্রেক্ষিতে যে গ্রামবাংলা সেখানে জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে অভ্যস্থ ছিলেন। অবশ্য শ্রেণি এবং সম্প্রদায় অনুসারে তাঁদের বসবাস ছিল বিভিন্ন পাড়ায়। পরস্পরের আপদ-বিপদ, আনন্দ-বিষাদ এবং উৎসব-অনুষ্ঠানে একে অপরের পাশে এসে দাঁড়াতেন, পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতেন এবং অংশ গ্রহণ করতেন। এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে মল্লিকা সেন তাঁর 'গতজন্মে' কবিতায় লিখছেন-

'কতদিন ধরে তোমার সঙ্গে
বসে বসে দুটো পান্তা খাচ্ছি
টক ঝাল নুন মাছের ভর্তা
যশোরের কোন কালিয়া গ্রামের
বদ্যিপাড়ায় এক্কাদোক্কা
বালিকা বধূ সে আমার ঠাকুমা।'[১২]

মুসলমান গোমস্তা-পেয়াদা হিন্দু গৃহস্থের বাড়ির ষষ্ঠী শুভচণ্ডী-মনসা-লক্ষ্মী-সত্য নারায়ণের পূজার প্রসাদ গ্রহণ করতে দ্বিধা করত না। সত্য নারায়ণ পূজার প্রসাদকে তারা বলতেন 'সত্য পীরের সিন্নি'। হিন্দুর বাড়িতে মুসলমান মজুর কাজ করত। তারা বরাবর মালিকদের বাড়িতেই ভাত খেত, তবে কলাপাতা উল্টো করে পেতে। এটাও লোকঐতিহ্য বৈকি।

ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো অনেক কবি তাঁদের কবিতায় দেবী লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ এনেছেন। লক্ষ্মী বিষয়ক লোক বিশ্বাস রয়েছে অন্নদাশঙ্করের একটি ছড়ায়-

কেউ দেখেনি কেমন করে
লক্ষ্মী প্যাঁচা এক ঘরে।
এটা কি এক সুলক্ষণ ?
ভাবছি আমি বিলক্ষণ।
ওরে আমার লক্ষ্মী প্যাঁচা

কোথায় পাবো সোনার খাঁচা ?

কোথায় তোরে রাখব বল ?

লক্ষ্মী হবেন অচঞ্চল ।[১৩]

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার চাঁদনী রাতে পূজা অন্তে শঙ্খ-কাঁসরের বাদ্যভান্ডে যখন বিজ্ঞাপিত হত যে পূজা সমাপ্ত এবং প্রসাদ গ্রহণের সময় সমাগত তখন গ্রামের পাড়ার মুসলমান কিশোর যুবকগণ দলে দলে হিন্দু গৃহস্থগণের আঙ্গিনায় উপস্থিত হয়ে সমস্বরে গান করত -

'লক্ষ্মী পূজোচাড্ডে ভুজো, ছেলে কাঁদছে,

মা ঠাকরোন মুড়কি হড়ুম দিতি নাগছে ।'

সহাস্য বদনে গৃহিনী তখন দলের প্রত্যেকের কোছে কোছে, সামর্থ অনুযায়ী পরিমাণে কিছুটা করে মুড়ি, মুড়কি, মোয়া এবং নারকোলের নাড়ু পরিবেশন করতেন, কিশোর-যুবকগণও আনন্দ সহকারে কোঁচড় থেকে সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে করতে অন্যান্য গৃহস্থ বাড়িগুলোর দিকে রওনা হত । এ তথ্য পাই শিব প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পুরোনো দিনের গ্রাম বাঙ্গালা' গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় । পুরোনো কাল, নতুন কালের কথা আমরা যতই বলিনা কেন, লোকজীবন ধারার চিরন্তনত্ব যে লুপ্ত হবার নয়, তার বড় প্রমাণ এই লক্ষ্মীপূজো ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন লেখেন—

'ছাতুবাবুর বাজারে চড়কের মেলার মাঝখানে

হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লো বর্গীর মতন বৃষ্টি

একজন মানুষ শুণ্যে ঝুলছে...'

তখন পরিদৃশ্যমান বাস্তব লোকোপাদানে মিশ্রিত হয়ে সমাজ সংস্কারের প্রেক্ষাপটকেই জীবন্ত করে । এখানে চড়কের মেলা এবং মানুষের শূন্যে ঝোলা লোক বিশ্বাসের সূত্রে অন্বিত । 'চড়ক' অনুষ্ঠানটি প্রাগার্য জনগণের প্রবর্তিত শিবলিঙ্গ উপাসনা । এর আর এক নাম 'গাজন' । সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নিষ্ঠাভরে এই উৎসব পালন করেন । বর্ণ হিন্দুরা এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন । এই অনুষ্ঠানে একজন প্রবীণ ব্যক্তি হন 'গাজনের সন্ন্যাসী' । তাঁকে গৈরিক বসন পরিধান করে সমগ্র চৈত্রমাস ব্যাপী একাহারী হয়ে সংযম

পালন করতে হয় এবং শিবলিঙ্গের আরাধনায় রত থাকতে হয় । মাসব্যাপী এই সন্ন্যাসীকে কাঠের কালো রঙের তেল-সিঁদূর চর্চিত, মহাদেবের লিঙ্গের প্রতীক স্বরূপ 'পাটবান' মাথায় করে একজন ঢাকী এবং সহচরবৃন্দ সহ, ঢক্কানিনাদ সহকারে হিন্দু বাড়ি গুলিতে পরিক্রমা করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয় । তখন তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'ব্যোম হর হর মহাদেব ।'

চৈত্রমাসের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন, একমাস কৃচ্ছ সাধনের সমাপ্তি দিবসে দুটি রোমাঞ্চকর সংস্কার সাধিত হয় । একটি গাজন সন্ন্যাসী খেজুর গাছের মাথায় চড়ে, তীক্ষাগ্র খেজুর কাঁটার উপর কিছুক্ষণ নৃত্য করে পদযুগল রক্তাক্ত করে নেমে আসবার সময়ে কিছু খেজুর ছিঁড়ে নিচে ফেলে দেন । ভক্তগণ সেগুলো সাগ্রহে সংগ্রহ করেন ভোলানাথের জটা স্বরূপ ।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি আরও ভয়ঙ্কর । এক বলা হয় 'পিঠে বাণ ফোঁড়া' । তারের আকারের একটি লোহার 'আঁকড়া' বা বড়শি সন্ন্যাসীর পিঠে ফুটিয়ে দিয়ে, কপিকলের সাহায্যে উপরে উঠিয়ে চক্রাকারে 'চরকিপাক' খাওয়ানো হয় । এটা সেই আদিম যুগ থেকে ভারতে প্রচলিত প্রথা, যাতে বিভিন্ন সাধকের কঠিন আত্মপীড়নের সাহায্যে দেহকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে পরমেশ্বরের প্রীতি উৎপাদনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় । অবশেষে অর্ধচেতন রক্তাক্ত কলেবর সন্ন্যাসীকে স্নানাদি করিয়ে একমাস ব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয় । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছাতুবাবুর বাজারে যে চড়কের মেলার কথা তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন তাতে দুই লোমহর্ষক অনুষ্ঠান দেখতে এবং কিছু কেনাকাটা করতে প্রচুর জনসমাগম ঘটে ।

'বন্দী জেগে আছো' কাব্যের 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতায় তিনি লিখছেন —

'সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি লজেন্স,
সেই রাস উৎসব আমার কেউ
ফিরিয়ে দেবে না ।'

পঞ্জিকার গণনা অনুসারে কার্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসের রাসপূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা মহোৎসব । ধনীগৃহে এই রাসযাত্রায় মহা

ধূমধামের সঙ্গে পূজা, হরি সংকীর্তন, ভাগবত পাঠ, পদকীর্তন, কথকতা, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয় । মুখ্যত ধর্মীয় উপদেশমূলক, গণশিক্ষামূলক এবং চিত্তবিনোদনের উপায় স্বরূপ এগুলি উপস্থাপিত হয়ে থাকে । এই রাসযাত্রা উৎসবের মূল আকর্ষণ 'রাসমেলা'-যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমভাবেই চিত্তাকর্ষক । রাস উৎসবের লোক ঐতিহ্যেকে কবি কবিতার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে শিল্পের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন ।

'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যের 'কবি ও দেবতা-পরিচয়' কবিতায় শক্তি চট্টো পাধ্যায় লিখেছেন—

'মন্দির দরগার মতো দুহাতে, দেহের অংশে বাঁধা
কুটোর ডগায় কত টুকরো ইট, পাথরের ডুমো,
কে কী যে মানত করে, কে যেন মানত করে আছে !
চেয়ে গেছে মনে মনে, উচ্চারণে নয় ।'

হিন্দু প্রধান গ্রামে মন্দির এবং মুসলমান জনবসতির কাছে দরগা আজও দুর্লক্ষ্য নয় । অনেকগুলো গ্রামের মধ্যে অপেক্ষাকৃত হিন্দু প্রধান গ্রামে থাকত শ্যামা মন্দির বা কালীবাড়ি । আজও পাকা মন্দির, নাটমন্দির, মৃন্ময় অথবা প্রস্তর নির্মিত শ্যামামূর্তি হিন্দু প্রধান এলাকায় চোখে পড়ে । অনুচ্চ বেদিকার ওপরে মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় । কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ সেবাইতের আবাসগৃহ নির্মিত হয় মন্দিরের পাশে । পুষ্পোদ্যান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা, পূজা দর্শনার্থীদের জন্য চালাঘর, প্রতিমার নিত্যপূজা, ভোগ, আরতি এসব আজও লুপ্ত হয় নি । শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেই মন্দিরের কথাই শুধু বলেননি, বলেছেন দরগার কথা । দরগাহ্ বা দরগা হল পীরের আস্তানা । এর আভিধানিক অর্থ, 'পীরের কবর সংলগ্ন পুণ্যগৃহ' । শুধু মুসলমান নয়, হিন্দুরাও এখানে মহামারীর সময়ে বা 'মড়ক' আরম্ভ হলে মানত করত । আজও বিপদে-আপদে পড়লে বিশ্বাসভরে হিন্দু-মুসলমান মানত করে । 'দরগা' শব্দের সাথে রয়েছে 'মুচোল্লি' শব্দের যোগ । 'মুচোল্লি'দের পারিবারিক পেশা ছিল মানুষের আপদে- বিপদে, অসুখে-বিসুখে, জিন-পরীর আক্রমণে, ভূত-পেত্নীর ভয়ে 'ঝাড়-ফুক করা'. তেলপড়া-জলপড়া' এবং

'তাবিজ-কবজ' দেওয়া। গরিব হিন্দু-মুসলমানেরা তা শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে গ্রহণ করত। এখনও গ্রাম বাংলায় এই প্রথা লুপ্ত হয় নি।

এবার কবি বর্ণিত 'মানত'-এর কথা। মূলত রোগ সারাবার উদ্দেশ্যে অনেকে ওলাইচণ্ডী দেবীর থানে গাছে কিংবা খুঁটিতে ঢিল বাঁধে। ওলাইচণ্ডী প্রধানত সমতল বঙ্গের দেবী। বর্ধমান, হুগলী, মেদিনিপুরের বহু গ্রামেই এই লৌকিক দেবতার থান আছে। দক্ষিণবঙ্গে তিনি হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পৃথক পৃথক নামে ও মূর্তিতে বিশেষ বিশেষ রীতি-উপচারে পূজিতা হন। মুসলমান সমাজে তিনি বনেদী বিবি নামে পরিচিতা। ইনি মুসলিম সমাজে ফকির দ্বারা আজও উপাসিতা। কোথাও ওলাইচণ্ডীর পূজারী ডোম বা হাড়ি জাতির লোক। কোথাও বা তিনি ডোম নারী দ্বারা পূজিতা হন। ওলা বিবির থানে বটঝুরিতে ঝুলে থাকে মানত করা ঢিল। পাথর ও ইটের টুকরো। ওলাইচণ্ডী, ওলাবিবি বা বিবিমা ওলা ওঠা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ঐ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ভক্তরা মানত করে 'কুটোর ডগায় টুকরো ইট, পাথরের ডুমো' ঝুলিয়ে দেয়। কোনো কোনো পল্লীর লোক এই পূজায় ওলা বিবির ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি গড়ে দেবীর থানে রেখে দেন। 'ঐরূপ ক্ষুদ্র মূর্তিকে 'ছলন' বা 'সলন' বলা হয়। ভক্তদের কেউ কেউ কলেরা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বা অন্য কোনো বাসনায় সিদ্ধ হবার ইচ্ছায় দেবীর থানের জানালায় বা থানের সংলগ্ন কোন গাছের ডালে দড়ি-সহযোগে একটি ঢিল ঝুলিয়ে রাখে, একে ঢিল বাধা মানত বলে।'[১৪]

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'কলকাতায় যীশু'। এই গ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা 'দেশ দেখাচ্ছে অন্ধকারে' পাই —

'উঠোন জুড়ে আল্পনা, আল্ পথের পাশে
হিজল গাছে সবুজ গোটা,
পুণ্যিপুকুর, মাঘমন্ডল,
টিনের চালে হিমের ফোঁটা।'

রঙ্গোলি, সোন্হা, অরিপন, ঝঙ্গতী, মন্ডন, লিখনুয়া, সাথিয়া, মুঙ্গলি, কোমল প্রভৃতি নানা অভিধায়, বহুনামে নন্দিত বাংলা তথা ভারতের অতি-পরিচিত আলপনা ব্রত-

পার্বনে, পূজা-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অন্যতম বিশিষ্ট মাঙ্গলিক উপচার হিশেবে বহুকাল ধরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশরূপে পরিগণ্য হয়ে আসছে। কবি নীরেন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'উঠোন জুড়ে আলপনা' তখন আলপনার যে নান্দনিক দিক, তার মঙ্গল বিধায়ক চরিত্র যা আমাদের বিশ্বাসে লীন হয়ে আছে, সেই শিল্পকলার বিষয়টি মানসপটে উদিত হয়। আমাদের মনে পড়ে, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফেলে আসা কালের লুকিয়ে থাকা সুপ্রচুর স্মৃতি অবশেষ। স্মরণে আনি এই শিল্পকলার ঐতিহাসিক সত্যটি। ইতিহাস-পূর্বকালের চিত্রকলার অন্তরালে যে বিশেষ মানসিকতাটি ক্রিয়াশীল ছিল, আলপনার মধ্যেও সেই অস্তিত্বময় যাদুশক্তির বিশ্বাস পরিমন্ডলটি দুর্নিরীক্ষ নয়। 'আদিম মানুষের চিত্রকলার অবলীন তাৎপর্যটি ছিল জীবন ও জীবিকার জন্য কিছু অর্জন করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই 'কিছু' অবধারিতভাবে ছিল শিকারযোগ্য কোনো প্রাণী। পরবর্তীকালে আলপনার যে ব্যবহারিক অভিপ্রকাশ ঘটেছে, তার উৎস অবশ্য শিকার এবং সংগ্রহ ভিত্তিক আদিম অর্থনীতি নয়, বরঞ্চ কৃষি-নির্ভর সমাজের পরিমণ্ডল। ... আদিম প্রপিতামহরা তাঁদের শিল্পকলা চর্চার ফলশ্রুতিতেজাদুশক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠা আকাঙ্খার চরিতার্থতা ঘটাবে, এমনই মনে করতেন। শিকারের ছবি আঁকলে বাস্তবেও অনুরূপ শিকারের ব্যাপারটি সংঘটিত হবে, কিংবা কতগুলি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন প্রতীকী চিত্র আঁকলে বিশেষ বিশেষ ধরণের কামনা-প্রত্যাশার পরিপূরণ হবে-ইত্যাদি মর্মে তাঁদের যে-সব ধ্যান-ধারণা ছিল, তা-ই বিবর্তিত হয়েছে আলপনার ক্ষেত্রেও। ধানের ছড়া আঁকলে সত্যিকারের পুকুর মাছের ছানাপোনায় ভরে যাবে, বাড়ি, মরাই, ফলন্ত গাছ, ফুলন্ত নদী, উড়ন্ত পাখি ইত্যাদির ছবি আলপনায় ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে বাস্তব ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবেশ তৈরি হবে-এইসব আকাঙ্খা-বাসনাই লুকিয়ে রয়েছে আলপনা রচনার প্রেরণার আড়ালে। স্পষ্টতই, এ হল সাদৃশ্য বা অনুকৃতি মূলক জাদুর সম্পর্কে বিশ্বাসলব্ধ ফল। সেঁজুতি ব্রতের একটি মন্ত্রকে অনুধাবন করলেই একথার যাচাই হতে পারে—

'আমি আঁকি পিটুলির গোলা
আমার হোক ধানের গোলা।

আমি আঁকি পিটুলির বালা
আমার হোক সোনার বালা ।[১৫]

The Golden Bough গ্রন্থে *James George Frazer*-এর বক্তব্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করি পল্লব সেনগুপ্তের উপরোক্ত মন্তব্যে-

'Sympathetic or imitative magic is that like produces like on, in other words, that an effect resembles its cause .... The most familiar application of the principle that like produces like is the attempt which has been made by many peoples in many ages to injure or destroy an enemy by injuring or destroying an image of him in the belief that, just as the image suffers, so does the man, and that when it perishes he must die.' [১৬]

আসল কথা, আলপনাই হোক আর ব্রত- অনুষ্ঠানই হোক, সে সব কিছুর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে মানুষের অদম্য, অন্তহীন কামনা বাসনা । আলোচ্য 'দেশ দেখাচ্ছে অন্ধকারে' কবিতায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যখন 'পুণ্যিপুকুর' ও 'মাঘমন্ডল' শব্দ দুটি ব্যবহার করেন তখন তাতেও থাকে কামনা পূরণের বাসনা । লোক-ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে 'পুণ্যিপুকুর' ও মাঘমন্ডলে'র আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না ।

বাংলায় যে ছয় ঋতু তার প্রথমটিই হল গ্রীষ্ম । এসময় নদী-নালা-খাল বিলের জল শুকিয়ে যায় । বৈশাখে পুকুরে যাতে জল না শুকোয়, গরমে যাতে গাছ না মরে, এই কামনা করে 'পুণ্যিপুকুর ব্রত করা হয় । এই ব্রতে মেয়েদের কামনা –

পুন্নিপুকুর পুষ্পমালা
কে পুজেরে দুপুর বেলা ?
আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না ।

বসুধারা ব্রতের মতো এই ব্রতেও বৃষ্টির কামনা করা হয়। এই ব্রতের মূলে শুধু কামনা নেই, কিছুটা ধর্ম প্রেরণাও আছে।

জলকামনায় যেমন 'পুণ্যিপুকুর', তেমনি আলোর কামনায় 'মাঘমন্ডলের ব্রত'। 'মাঘমন্ডল' ব্রত মূলত সূর্য উপাসনা ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্ববঙ্গেই মাঘমন্ডলের ঘটা খুব বেশি। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলেও কিছু কিছু পরিমাণে এ ব্রতের প্রচলন রয়েছে। 'মাঘ মাসের পহেলা থেকেই মেয়েরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঘুম থেকে উঠে শুচিশুদ্ধভাবে দল বেঁধে এগিয়ে যায় পুকুর ঘাটের দিকে। প্রথমেই তারা সূর্যের ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘুম ভাঙানোর পরেই তো সূর্যদেব বলবেন, 'মুখ ধোবার জল কোথায়? তাই মেয়েরা বলে -

চোখে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে
শরুয়া মরুয়া এই দুটি ফুল লাগে।

সূর্যদেবের মুখ ধোওয়ার সব ব্যবস্থা করে মেয়েরা বলতে থাকে-

উঠরে উঠরে সূর্য উদয় দিয়া
বাওন বাড়ির পিছন দিয়া।

তারপর বলে-

মাঘ মন্ডল মাঘ মন্ডল
সোনার কোন্ডল
সোনার কোন্ডলে ঢালিয়া মউ
আমি যেন হই বড় মানুষের বউ।

মাঘ মন্ডল ব্রতের ভিতরের ছোট ছোট মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে। পূর্বাকাশ লাল হবার সাথে সাথে মেয়েরা তাড়াতাড়ি করে তাদের পূজো শেষ করতে করতে বলে-

সূর্য ঠাকুরের দুয়ারে কাঁশর ঘন্টা বাজে
তবু না সূর্য ঠাকুরের নিদ্রা ভাঙ্গে।

পরপর পাঁচবছর ধরে মেয়েদের এইভাবে ব্রত করার পর শেষবারে, শেষ দিনে করতে হয় উদ্যাপন। এই পাঁচ বছরের মধ্যে পুরোহিতের ডাক পড়বার কোনো দরকার নেই। মেয়েরাই সব। তবে শেষ বার পুরোহিত ডাকতে হয়। সে বছর একটু খরচ-খরচাও আছে। এইবার উঠোনে বিশাল আকৃতির আলপনা দিতে হয়। তাতে থাকে পশুপাখি ও সূর্যের মন্ডল। ক্ষীরের নাড়ু দিয়ে ভোগ দিতে হয়।

মেয়েরা অনেকক্ষণ হয় পুকুরঘাটে এসেছে। এখনও বাড়ি ফিরছে না কেন, দেখবার জন্য এগিয়ে আসে তাদের দিদিরা-যাদের আগের বছরে এই ব্রত সাঙ্গ হয়ে গেছে। শেষটায় তারাও এসে যোগ দেয়, 'আসতে আছেন সূর্যাই ঠাকুর নেবে নেবে সে।' সন্ধ্যায়, পিটুলি গোলা দিয়ে আঁকা সূর্য মন্ডলের পাশে বসে শোনে এই ব্রতের কাহিনি।'[১৭]

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পাই বাউলের কথা-

লালমাটির ধুলো উড়িয়ে
হাতে একতারা নিয়ে
ঘুঙুর পায়ে বাউল
আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেল।[১৮]

লালমাটির বাউল অর্থাৎ বীরভূমের বাউল। এঁরা সংসারের কাজকর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে 'মনের মানুষের' সন্ধান করে বেড়ান। অজানাকে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে এঁরা বলেন —

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

ঐশী প্রেমে 'বেভুল' এক শ্রেণির সাধকই হলেন কবি-কথিত বীরভূমের মাটিতে লালধুলো উড়িয়ে, হাতে একতারা নিয়ে, ঘুঙুর পায়ে ঈশ্বর-সাধন পথের পথিক। এঁদের সাধনা কোনো শাস্ত্র পন্থা অবলম্বিত নয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামী আধ্যাত্মিকতার স্রোত এঁদের মানস-সরোবরে এসে মিলিত হয়েছে। এঁরা যে গীত পরিবেশন করেন তা মূলত ধর্মীয়। এঁদের যে তত্ত্বকথা ও দর্শন তাতে রয়েছে ষটচক্রের প্রসঙ্গ, যার প্রধান কথা আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, শরীর-মধ্যস্থ শক্তিরূপিনী কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা। 'কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে অপরিসীম আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। তন্ত্রমতে শরীরে মঞ্জিল আছে,

ছয়টি মঞ্জিলের ছয়টি নাম আছে। যথা-মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা। প্রত্যেকটি কেন্দ্রএক একটি পদ্মের ন্যায়। তার দল আছে এবং প্রত্যেক দলে সাঙ্কেতিক অক্ষর এবং অদৃশ্য মূর্তির পরিকল্পনা রয়েছে। প্রত্যেক কেন্দ্রের অবস্থান বিভিন্ন স্থলে। মেরুদন্ডের উপর দিয়ে দুইটি নাড়ীকে অবলম্বন করে কেন্দ্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে ইড়া আর পিঙ্গলা নাম্মী দুইটি নাড়ী পরস্পরের সাথে জড়িত হয়েছে। সুষুম্না নাড়ীকে কেন্দ্র করে মেরুদন্ডের প্রান্তভাগ থেকে উত্থিত হয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়েছে এবং সম্মিলিত হয়েছে। মেরুদন্ড তান্ত্রিক সাধনায় বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে। ছয়টি কেন্দ্র এই মেরুদন্ডের উপর অবস্থিত।'[১৯]

বুদ্ধদেব বসু ১৯৭০-এ লিখেছিলেন 'স্বাগত বিদায়' কাব্য। ঐ কাব্যের একটি কবিতা 'সাবিত্রীর জন্য কবিতা'-তে কবি লিখেছেন-

'যারা ঘোমটায় মুখ ঢেকে ধান ভানে ঢেঁকিতে অনবরত
একজন পা চালায়-অতি দক্ষ-ক্ষিপ্র হাতে তুলে নেয় অন্যজন,
ভিন্ন করে শষ্য, তুষি ছন্দে তালে অলঙ্ঘ্য নিয়মে
শষ্য তোলে ঘরে, আর ফেলে দেয় যা ছিলো পৃথিবী জুড়ে'।

কৃষি-কেন্দ্রিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই ঢেঁকিতে ধান ভানার বাস্তব চিত্রটি আধুনিক কাব্যশৈলীর প্রকাশবাহী হয়ে উঠেছে। কবিতাটির উদ্ধৃতাংশে লোকায়ত ঐতিহ্য ঘোমটা, ঢেঁকি, শষ্য, তুষি প্রভৃতি শব্দে সঞ্জীবিত হয়েছে। কবির ব্যবহৃত ঢেঁকি শব্দটির লৌকিক প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বলা যায়, কয়েক দশক আগেও গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ঢেঁকির প্রচলন ছিল। ঢেঁকিতে ধানভানা হত আর সেই সঙ্গে গীত হত শ্রমসংগীত ঢেঁকির গান -

'ধান ধান ধান ভানবো না তো কি।
আগাগোড়া মুলুক চাল খাবো নাতো কি।।
ঢেঁকিটা বলেরে ভাই আমি নারদের হাতি।
অষ্ট অঙ্গ বাদ দিয়ে লেজে মারে লাথি।।"

একজন পা চালাতে চালাতে গান গায়, অন্য নারীরা 'ধুয়ো' ধরে। ঢেঁকির সঙ্গে যে শব্দগুলি

প্রয়োগিক-প্রকরণ দক্ষতায় দেশজ ঐতিহ্যেকে প্রকাশ করে সেগুলি হল 'আশ কলাই', 'প', ঢুঁশুলি', 'গড়', 'শিকননড়ি', 'ঝাঁটা, 'ঝুড়ি,' 'কুলো', 'কাঠা'। 'ঢেঁকির গান'-এ উপরের প্রতিটি শব্দই ছন্দোবদ্ধ পংক্তিতে বিষয়-সংহতি বজায় রেখেছে এইভাবে —

'আশ কলাইটা বলেরে ভাই আটে পিঠে দড়।
আমি না থাকলে ঢেঁকি কাত হয়ে পড় ।।
প' দুটি বলেরে ভাই আমরা দুটি ভাই।
মাটির ভেতর পোঁতা আছি কেষ্ট গুণ গাই ।।
ঢুঁশুলিটা বলে রে ভাই লোহা বাঁধানো মুখ।
আমার এঁটো খেয়ে ব্যাটাদের চাঁদ পারা মুখ ।।
গড়টা বলে রে ভাই আমার নামটি হরে।
ঢেঁকি ভাই ধান ভানে আমি রাখি ধরে ।।
শিকন নড়িটা বলেরে ভাই আমার মুখে কানি।
ঢেঁকি ভাই ধান ভানে আমি পড়ে টানি ।।
ঝাঁটাটি বলেরে ভাই আমার নামটি খড়ো।
ঢেঁকি ভাই ধান ভানে আমি করি জড়ো ।।
ঝুড়িটা বলেরে ভাই ডোম বাড়িতে হই।
ঢেঁকি ভানে ধান আমি পেটে করে রই ।।
কুলোটা বলেরে ভাই আমার নাম হুঁশ।
ঢেঁকি ভাই ধান ভানে আমি উড়াই তুশ ।।
কাটাটি বলেরে ভাই আমার নামটি পেপে।
ঢেঁকি ভাই ধান ভানে, আমি রাখি মেপে ।।[২০]

(সংগ্রাহক ঃ শ্রী শিবশংকর ঘোষ
গ্রাম + পোঃ এরুয়ার, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ)

কবি মনীন্দ্র গুপ্তের "শ্রেষ্ঠ কবিতা" কাব্য গ্রন্থে 'ব্রহ্মসুত্র' নামে একটি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাটিতে 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' ছাড়াটির প্রসঙ্গ রয়েছে -

'শুয়ে শুয়ে ছেলে বেলার কথা মনে পড়ে —
তখন ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিরা
ঘুমের মধ্যে পান সুপারি খেয়ে
গল্প গাছা করে কত আনন্দ করে গেছে ।'

(পৃষ্ঠা ১১৩)

শিশুদের নিয়ে মায়ের ভাবনার অন্ত নেই । তাঁদের মাতৃত্বের এই ভাবনা-চিন্তার কিছু ছাপ রেখেছেন তাঁদের ছড়ায় । এই ছড়াগুলি শুধু ছড়াই নয় । তাঁদের ধারণা, ছড়াগুলি মন্ত্র-তন্ত্রের মতো আলৌকিক শক্তি সম্পন্ন । শুধুমাত্র ঘুম পাড়ানো শিশু নয়, অনেক ছড়াই আলৌকিক শক্তি সম্পন্ন রক্ষাকবজের মতো শিশুর কল্যাণার্থে আবৃত্তি করা হত । গ্রামের মায়েরা এখনও 'দুষ্ট মেয়ে বা দুষ্ট লোকের' চোখের নজর এড়ানোর জন্য সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জেলে শিশুদের মুখের কাছে প্রদীপ ধরে ছড়া কাটেন -

আলোবাতি নড়ে চড়ে
যে আমার বাছাকে খুঁড়ে
তার যেন মুখটি পুড়ে ।

মায়েরা শিশুদের বাইরের লোকের দৃষ্টি থেকে আড়াল রাখার চেষ্টা করতেন, কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হত না । ছেলের ঠাকুমা বা কোন বয়স্ক রমণী ছেলেকে কোলে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বের হতেন । তাই, শিশুকে বাইরে পাঠাবার আগে মা আলতো ভাবে ছেলের কড়ে আঙুল কামড়ে দিয়ে অস্ফুট স্বরে ছড়া কাটতেন -

ষাট ষাট বালাই
সব ডাইনের মুখ জ্বালাই ।
ডান ডাইন ফুট কানাই
সব ডাইনের মুখ পুড়াই ।।

(আমার দিদিমা কনকপ্রভা রায়ের মুখ থেকে শোনা)

আর একটি কবিতায় মনীন্দ্র গুপ্ত ব্রহ্মদৈত্যের কথা উল্লেখ করেছেন -

'দাদুর বেই মশাই মরে বহ্মদৈত্য হয়েছেন
এ বাড়ির বেল গাছেই এসে আশ্রয় নিয়েছেন ।'[২১]

ব্রহ্মদৈত্য হল প্রেতযোনি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। বেল গাছেই তার আশ্রয়, একে নিয়ে শিশুমনের উপযোগী নানা গল্প বাংলা শিশু সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভূত-পেত্নি-দৈত্য-দানো নিয়ে মেয়েদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। গ্রামের গাছ-পালার রাস্তায় ভূতের ছড়াছড়ি রয়েছে বলে তাঁদের বিশ্বাস "এদের মধ্যে আবার ব্রহ্মদৈত্য। লম্বা ঠ্যাং ওয়ালা, খড়ম পরিহিত ব্রহ্মদৈত্যকে শিশুরা বড় ভয় করে। কারো দেহে এই দৈত্য ভয় করলে ওঝা এসে তার প্রতিবিধান করত। মায়েরা সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন কখন তাঁর সন্তান ব্রহ্মদৈত্যের কবলে পড়ে। সে জন্য রক্ষা কবচ হিশেবে মায়েরা অলৌকিক ছড়া শিখিয়ে দিতেন ছেলে মেয়েদের। লোক বিশ্বাস এই যে সব মানুষ মরার পর স্বর্গে যায় না, অনেকে মরে ভূত-প্রেত হয়। 'অশুচি' অবস্থায় একা কাউকে পেলে ভূত-প্রেতিনী-শাকচুন্নী-ব্রহ্মদৈত্য তার ঘাড় মটকায়, অমাবস্যা কিংবা শনি-মঙ্গলবার রাতের অন্ধকারে গাছের ডালে ডালে ওই উদ্দেশ্যেই ওৎ পেতে বসে বসে ঠ্যাং দোলায়। বাঁশঝাড়, শেওড়াগাছ,এবং চালতাগাছে এদের বাস। আর ব্রহ্মদৈত্যের বাসস্থান ছিল অর্ধমৃত বেলগাছ কিংবা উঁচু অশ্বত্থগাছে। আর এরা সকলেই পূর্বোক্ত রাতগুলিতে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বের হত 'শিকারের' সন্ধানে।

ব্রহ্মদৈত্য বা 'বেহ্মদত্যি' একবার কারও ঘাড়ে চাপলে সহজে নামতে চাইত না। রোগিকে 'ঝাঁটা পেটা' করে এমন কী শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে, তাঁর ঝাঁঝালো ধোঁয়া শুকিয়েও সহজে তাড়ানো যেত না। শেষ পর্যন্ত 'বেহ্মদত্যি' রোগীর ঘাড় থেকে নেমে গেলে নিদর্শন স্বরূপ ভেঙে রেখে যেত নিকটবর্তী বেলগাছের একটি 'মগ ডাল'। ব্রহ্মদৈত্য রোগীর ঘাড় থেকে নেমে গেলে রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ত এবং বেশ কয়েকদিন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মত আচরণ করত।"

(আমার শ্রদ্ধেয়া দিদিমা কনকপ্রভা রায়ের কাছ থেকে ২০০৮ সালে শোনা তথ্যের ভিত্তিতে)

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'পাড়ের কাঁথা'র উল্লেখ করেছেন তাঁর কবিতায়-

'পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা ছাওয়া-
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে।'

(শ্রেষ্ঠ কবিতা/'আজ আমি'/পৃঃ ৬২)

কাপড়ের পাড় থেকে সুতো তুলে একসময় তৈরি হত পাড়ের কাঁথা। কাঁথা তৈরি করতেন বাংলার মা-বোনেরা। কবি জসিম উদ্দিন পাড়ের কাঁথা প্রসঙ্গে 'নকসি কাঁথার মাঠ' এ লিখেছেন—

এই কাঁথা যবে আরম্ভ করে তখন সে একদিন।
কৃষানীর ঘরে আদরিনী মেয়ে সারা গায়ে সুখ চিন ।।

উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানে পাই-

যদি আইসে মোর পতি কালা
দিম তাক্ মুই পাড়ের কাঁথা রে।

বরাক ও সুরমা উপত্যকার একটি বিবাহ গীতে পাই-

সিলেটর বাজারো মিলে সুন্দর সুন্দর সূতা।
তা আনাই বানাই দেও ঢুলিয়ার কাঁথা ।।

শ্রীহট্টের গোপাল নৃত্যের একটি গীতে পাই-

নাচ নাচরে গোপাল
উড়াই দুই হাতা।
নাচিলে দিদিমায় দিবা
তোমায় সুন্দর কাঁথা ।।

যদিও সংস্কৃত 'কন্থা' শব্দ থেকে কাঁথা শব্দের উৎপত্তি, 'নক্সি কন্থা' নামে কোনো বাক্যবন্ধ আমরা সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডারে পাই নি। সুতরাং পাড়ের সূতো দিয়ে তৈরি নকশি কাঁথা নামটি অর্বাচীন কালের বলেই মনে হয়। পাড়ের কাঁথার শিল্পকর্মে হিন্দু-মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বিদ্যমান। পাড়ের কাঁথা লোকশিল্পের বিকাশের ধারার সঙ্গে একান্ত ভাবে যুক্ত। শক্তি চট্টোপাধ্যায় শুধু 'পাড়ের কাঁথা'র উল্লেখ করেন নি, তিনি মাটির বাড়ির' কথাও বলেছেন। এই দুটি শব্দবন্ধে গ্রাম জীবনের প্রাণ-প্রবাহ স্পষ্ট ধরা পড়ে। 'কাঁথা' ও 'বাড়ি' শব্দ দুটি কবি নির্বাচিত করেছেন তাঁর কাব্য রচনার উপকরণ রূপে। এখানে কবিচেতনার সঙ্গে লোকচেতনার সংযোগ ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবেই।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যের 'ফাগ' কবিতায় (পৃঃ ৪৮) 'দধিমঙ্গলের' উল্লেখ রয়েছে-

''উৎসব শুরুতে ছিল ভোরবেলা।
দধিমঙ্গলের ভোরবেলা। ফিরোজা রঙের।''

'দধিমঙ্গল' কোথাও কোথাও 'দই ভাত' নামেও পরিচিত। বাঙালি-বিবাহের এটি একটি বিশেষ সংস্কার। দধিমঙ্গলের জন্য আগে থেকে এক হাঁড়ি দই এনে রেখে দেওয়া হয়। বিবাহ উৎসবে অনুষ্ঠেয় মঙ্গলাচারে দধিসম্পাদ্য ক্রিয়াদি শুধু হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মুসলিম সমাজেও দধিমঙ্গল অনুষ্ঠান প্রচলিত। 'পুরোনো দিনের গ্রাম বাঙ্গলা' গ্রন্থে শ্রী শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন,'দুল্‌হা সাজানো হয়ে গেলে, মা দইভাত মেখে তাকে আড়াই লোকমা দইভাত খাইয়ে দেন। অবশিষ্ট ভাত যে পুকুর থেকে 'পানি' আনা হয়, সেই পুকুরে ফেলে দেন। এক পাতিল ভাত গামলায় ঢেলে ভাতে দই মাখিয়ে দিয়ে, বর তিন লোকমা দই ভাত খায়। উপস্থিত অন্যরাও তাতে অংশ গ্রহণ করে।'

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ৪৬ পৃষ্ঠায় চৈতালী চট্টোপাধ্যায় 'অশোক' কবিতায় লিখেছেন—

'সংক্রান্তি যোগ আজ।
আমিও এবার তবে সরাখানি ভাসাই
নদীতে।'

গঙ্গা পুজোর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব হল পৌষ সংক্রান্তি। এ সময় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হিন্দু মেয়েরা জলে সরা ভাসায়। হিন্দু মেয়েরা পৌষ সংক্রান্তির দিন ছোট ছোট মাটির সরায় বাতাসা,মোমবাতি বা 'পিদিম' জ্বালিয়ে কাছাকাছি নদী থাকলে নদীতে কিংবা পুকুরেই ভাসিয়ে দেয়। বেরা ভাসানো বা সেদো ভাসানো উৎসবের সাথে 'সরা ভাসানোর' যথেষ্ট মিল রয়েছে।

কবি নির্মল হালদার যে 'কাক তাড়ুয়ার' কথা বলেছেন তাঁর ''শিশুর কথা'' কবিতায় তার অস্তিত্ব আজও বিলুপ্ত হয় নি। এখনও বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ফসলের মাঠে গেলে 'কাক তাড়ুয়া'র দেখা মেলে। মাঠ ভরা ফসলের উপর যাতে কারো কু-দৃষ্টি না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে 'কাক তাড়ুয়া' বানিয়ে ভরা ফসল খেতে তাকে স্থাপন করা হয় বাঁশ-দড়ি দিয়ে যোগ চিহ্নের মত একটি কাঠামোয় পুরানো ছেড়া জামা পরিয়ে, পুরোনো একটি মাটির হাঁড়িতে সাদা-কালো রং দিয়ে চোখ-নাক-মুখ একে বাঁশের কাঠামোর ওপর হাঁড়িতে

বসানো হয়। কোথাও এর উপর ছেঁড়া জুতো বা চটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কাক তাড়ুয়া মানুষের কিম্ভুত কিমাকার রূপ নিয়ে যখন ফসলের মাঠে 'শোভা' পায় তখন তা প্রত্যেকেরই নজর কাড়ে। প্রথম নজর কাক তাড়ুয়ার উপর পড়লে ফসলের কোনো ক্ষতি হয় না - এই লোক বিশ্বাসের আশ্রয়ে নির্মল হালদার তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পাঠকরূপী একজন সামাজিক প্রতিনিধির কাছে উপস্থিত করেন পাঠক-চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটাতে।

মনীন্দ্র গুপ্তের 'অসি' কবিতায় পাই 'শিবের আরাধনার' কথা। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যের এই কবিতার দুটি পংক্তি-

মেয়েটি সমস্ত যৌবন শিবের
আরাধনা করে এসেছে।'

(পৃষ্ঠা ১০০)

বাংলার লোক জীবনের সাথে যুক্ত শিব চতুর্দশী বা মহাশিবরাত্রি। সাধারণত ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত এই পূজায় বেশি সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয় প্রসিদ্ধ শৈব পীঠস্থানগুলিতে। এই পূজায় রমণীরা, বিশেষ করে কুমারীরা সারাদিন ব্যাপী নির্জলা উপবাস করে রাত্রে প্রহরে-প্রহরে পূজার্চনা করেন এবং বিল্বপত্র সহযোগে শিবলিঙ্গে জলসিঞ্চন করেন। মহিলাদের কামনা সকলের কল্যাণ হোক এবং কুমারী বা বালিকাদের মনে থাকে ভোলানাথ-মহেশ্বরের মতো করুণাময় স্বামী লাভের বাসনা। এই সনাতন লোক বিশ্বাসকে কবি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন তাঁর কবিতায়।

আর একটি কবিতায় কবি নির্মল হালদার লিখছেন -

'চলেছি .....
চলতে চলতে বাঁশফুলের গন্ধের কথা ওঠে।
বাঁশফুল দেখিনি
একদিন না একদিন বাশফুল দেখবই।'

(শ্রেষ্ঠ কবিতা / 'তুমি ও নেই / পৃঃ ৭১)

বাংলার লোকজীবন তথা গ্রাম জীবনের সাথে বাঁশগাছের গভীর সম্বন্ধের কথা কারো অজানা নয়। এই বাঁশ বাগানের মাথার ওপর যখন চাঁদ ওঠে তখন এক অবুঝ শিশু তার মাকে প্রশ্ন করে

'মাগো আমার শোলোকবলা কাজলা দিদি কই ?' এই বাঁশ গাছে ফুল ফোটার সাথে রয়েছে অশুভ, অকল্যাণকর ইঙ্গিত। যে বছর বাঁশগাছে ফুল ফোটে সে বছর থেকেই শুরু হয় গ্রাম-মানুষের দুর্যোগ। এই লোকবিশ্বাসের পেছনে একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি কাজ করে। বাঁশফুল প্রতিবছর ফোটে না। ক্বচিৎ-কদাচিত যখন ফোটে, তখন ওই ফুলের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হয়। ফুলে ফুলে ভরে যায় বাঁশগাছের তলা। ইঁদুরের বড় প্রিয় এই বাঁশফুল। ফুল খেয়ে তারা সজীব হয় ও বংশবৃদ্ধি করে। পরে ইঁদুর-বাহিত প্লেগ রোগে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। সুতরাং বাঁশফুল লোকজীবনে বয়ে আনে অশুভ ইঙ্গিত। এই লোক বিশ্বাসকে কবি নির্মল হালদার কাব্য -শিল্পে স্থান দিয়ে তাকে ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছেন।

দাউদ হায়দার তাঁর একটি কবিতায় ভাটিয়ালি, মারিফতি গানের কথা বলেছেন। দাউদ হায়দারের কাব্য-ভাষা এইরকম –

'একজন মাঝি ও জেলে
বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বরে
ভাটিয়ালী গান গেয়ে ওঠে।'

(শ্রেষ্ঠ কবিতা / 'ভাটিয়ালীগান' / পৃঃ ১২২)

আল মাহমুদ লিখেছেন -

'আমাদেরই লোক তুমি / তোমার বাপের
'মারিফতির টান শুনে
বাতাস বেঁহুস হয়ে যেত।'

(শ্রেষ্ঠ কবিতা / 'খড়ের গম্বুজ')

বাংলা মূলত এক নদী-মাতৃক দেশ। সেইজন্য তার লোকসঙ্গীতের সুর নদ-নদীর চরিত্রের উপর করে গঠিত হয়েছে। বাংলার কিছু অংশের অধিবাসী নদী কিংবা হাওরের তীরেই বাস করে। হাওর অর্থ বিস্তৃত জলাভূমি। নিকটবর্তী পাহাড় অঞ্চলে যখন বর্ষাকালে অবিশ্রাম বৃষ্টিপাত হয়, তখন তার জলরাশি ক্রমাগত তাতে এসে সঞ্চিত হয়। এই অঞ্চলের নদ-নদী কিংবা হাওরের জলরাশি বহুদিন পর্যন্ত প্রায় স্থির থাকে,

তাতে কোনো স্রোত কিংবা প্রবাহ থাকে না। আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের সুর প্রকৃতির এই চরিত্রটির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। ভাটিয়ালি এই অঞ্চলেরই মানুষের আনন্দ-বেদনা, আশা-নৈরাশা তার সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। ছোট ছোট দ্বীপের মত গ্রামগুলোতে জলবন্দী কৃষকদের, কিংবা বিশাল জলরাশির উপর দিয়ে অলস গতিতে ভাসমান নৌকোর নিঃসঙ্গ মাঝিদের মনের ভাব এতে ব্যক্ত হয়ে থাকে। এই পরিবেশে মানুষ গভীর জীবন-দর্শনের কথা ধ্যান করে না, বরং তার পরিবর্তে জীবনের বাস্তব সত্য সম্পর্কে যা লেখে যা চোখ দিয়ে দেখে তার সম্বন্ধেই ভাবে।

'বাইরের গান' গোষ্ঠী সঙ্গীত, দশজনে মিলে তা গায়। 'ঘরের গান' ভাটিয়ালি নিঃসঙ্গ নির্জনে বসে একজনে গায়। তার ভিতর দিয়ে অন্তর্লোকের অনুভূতি প্রকাশ পায় বলে তা যেমন সত্য তেমনই মর্মস্পর্শী ও উদার এবং সে জন্যই বাংলার সর্বোত্তম লোকসঙ্গীত এই সুরেই রচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সুরই প্রধানতঃ অন্যান্য লোকসঙ্গীতের ভিত্তি হয়েছে। প্রেম ও ভক্তির মত তীব্র হৃদয়াবেগ প্রকাশের তা সার্থক বাহন। সেইজন্য যেখানে মিলনের পরিবর্তে বিচ্ছেদ বা নৈরাশ্য আছে, তার ভিতর দিয়ে তাই সার্থক প্রকাশ পেয়েছে। গভীর ভক্তিমূলক ধর্মসঙ্গীতও এই সুরে সার্থক প্রকাশ পেয়ে থাকে। অন্তর্নিহিত ভাবের গভীরতার মধ্য থেকে যে সঙ্গীত উৎসারিত হয়, তাই ভাটিয়ালির সুরে বাঁধা হয়ে থাকে।

আগেই বলেছি, গ্রামাঞ্চলে ভাটিয়ালি গানের সঙ্গে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় না। গ্রামবাসীর পক্ষে এই গান কেবল মাত্র পুরোপুরি যে মানসিক অবসরের গান তাই নয়, তা শারীরিক অবসরেরও গান বলা যায়। নৌকোর মাঝির পক্ষে এ কথা আরো সত্য, সে নদীর ভাটিতে নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে অলস ভাবে সোজা করে হালটি ধরে এই গান গায়, এবং নৌকো আপনি ভাটিতে চলে। ভাটিয়ালি শব্দটির প্রকৃত অর্থ নদীর ভাটিতে চলা।

ভাটিয়ালির সঙ্গে কোন বিশেষ রাগসঙ্গীতের ঐক্য নেই। যদিও তার সুরের কোন কোন স্তরে বিলাবল রাগের মৌলিক ঠাটের কিছু নিদর্শন আছে, অনেকে এমনও মনে করেন যে তার মধ্যে বেহাগ-পাহাড়ী এবং ঝিঁঝোটি রাগের মিশ্রণ হয়েছে।

ভাটিয়ালির মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে তার সুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুব চড়া পর্দায় উঠে যায়, তারপর হয় হঠাৎ খুব নিচু পর্দায় নেমে আসে, নয়ত ধীরে ধীরে মাঝ পর্দায় নেমে তারপর একেবারে খুব নিচু পর্দায় নামে; এমন কি, অনেক সময় তা শুনতেও পাওয়া যায় না। নিচে নামবার সময় দীর্ঘ, আরো দীর্ঘ টানের মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়। নবান্নের কথা উল্লেখ করেছেন অনীক মাহমুদ-

'মাঝির কণ্ঠে আসে না ছাপিয়া ভাটিয়ালি গান,

নবান্নের আমোদ উল্লসিত হয় না আর .... '[২২]

নবান্ন অর্থাৎ নব অন্ন। সম্বচ্ছরের প্রথম নতুন অন্ন গ্রহণ। অগ্রহায়ণ মাসে শুভ দিন দেখে একটা পাত্রে আগ্-চাল তুলে রেখে এবং ঘটে চাল দিয়ে তারপর নবান্ন মাখা হয় নারকেল বাটা চিনি ও গুড়ের সঙ্গে, সামান্য আদা, গরম-মশলা আর নুনও মেশানো হয় এর সঙ্গে। কখনো শুভক্ষণ নির্ণয় করে চাল বাটা, কমলা লেবু, পাটালি অর্থাৎ সেই ঋতুর যা কিছু নতুন তা একসঙ্গে মেখে পাঁচ জনে উৎসবের উপকরণ হিশেবে পরিবেশিত হয়। বিকেলে আবার রান্না করে অনেক রকম তরকারি সহযোগে 'ভাল মাছ টক'-এর সঙ্গে খাওয়া হয়। বাসি জিনিস বা যে খাদ্য থাকে তার প্রচলন বাসি নবান্ন হিশেবে। নবান্নের সময় কাচ্চা বাচ্চারা কাক-ভোরে উঠে সমস্ত বায়স-সমাজকে নিমন্ত্রণ করে বলে, 'ও কাক, কো কো, আমাদের বাড়ি শুভ নবান্ন, আসবে যাবে কাক, বলি কি নেবে, নিয়ে তুমি উত্তর মুখে যাবে ......।' এর ফলে সর্বত্র মঙ্গল সূচনা হয় বলে বিশ্বাস। নবান্নের শুভ নির্দিষ্ট দিনেই পিতৃপুরুষকে জল দেওয়ার নিয়ম আছে। গ্রাম বাংলায় নবান্ন উৎসব নব্য ধান্য বরণের এক বহুল প্রচলিত উৎসব -যা আজ অবলুপ্তির পথে। (তথ্য-উৎসঃ সুনীল বসুর প্রবন্ধ 'শীতের চলচ্চিত্র / দেশ, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৬)।

লোকশিল্পের বিশেষ উপাদান 'শিকার পাইলা''র কথা পাই আল মাহমুদের 'আমিও রাস্তায়' কবিতায়-

'শিকার পাইলা খুলে দেখবে নেই ভাত বা সালুন।

(শ্রেষ্ঠ কবিতা)

'শিকার পাইলা' হল ছিকে বা শিকে। পাট অথবা শন দিয়ে তৈরি জিনিস-পত্র রাখার জন্য তৈরি এক

ধরণের ঝুলানো পাত্রে একসময় তুলে রাখা হত ভাতের হাঁড়ি , তৈলাক্ত মাটির হাঁড়ি । এই মাটির হাড়িতেই এক সময় তুলে রাখা হত গুড়, নারকোলের নাড়ু, রসকরা, নানা ধরণের আচার, ঘি, দুধের সর, দই ইত্যাদি ।

কাজল রসিদ ও পুলক কান্তি ধর সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ 'কাব্যস্নান'-এর 'বর্ষা এল' কবিতায় ওপার বাংলার কবি আ. ফ. ম. ইয়াহিয়া 'শুভ পুণ্যহ' উৎসবের কথা বলেছেন-

'.....বাঙালির শত জনমের প্রেমে উচ্ছ্বল
শুভ পুণ্যাহ ।
তুমি রূপসী বাংলার প্রাণ স্পন্দন ।'

গ্রাম বাংলায় একসময় প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ, জমিদারের কাছারিতে অনুষ্ঠিত হত পুণ্যাহ । অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগেই পাইক-বরকন্দাজ মারফৎ কাছারির অধীনস্ত প্রজাদের পাঠানো হত লাল রঙে ছাপানো পুণ্যাহের নিমন্ত্রণ পত্র । নিমন্ত্রণ পত্রের বয়ান ছিল মোটামুটি এই রকম -

শ্রীশ্রী গণেশায় নমঃ

জানিবেক আগামী ১লা বৈশাখ, রবিবার, সন ১৩২৩ সাল শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশপতি মজুমদার, জমিদার বাহাদুরের হলিধানীস্থ কাছারি বাড়ীতে, শুভ পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হইবেক ।

উক্ত দিবস স্বয়ং কাছারি বাড়ীতে হাজির হইয়া, পুণ্যাহ উপলক্ষে খাজনা এবং নজরানা আদায় দিয়া দাখিলা লইবেক । উল্লেখ থাকে যে উক্ত দিবস সায়াহ্নে বিগত সন ১৩২২ সালের রোকড় বন্ধ হইয়া যাইবেক । দধি-মৎস সাথ আনিবেক । ইতি ২০ শে চৈত্র । সন ১৩২২ সাল ।

শ্রী ভাগ্যধর দেবশর্ম্মন ঃ
নায়েব / হলিধনী কাছারি ।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত প্রজাবৃন্দ পুন্যাহের দিনে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়ে কিছু পরিমাণে খাজনা পরিশোধ করে দাখিলা নিতেন, তৎসহ জমিদার বাহাদুরের

নজরানা, নায়েব-গোমস্তা ও বরকন্দাজের আবওয়াব ও তহুরি জমা দিতেন। প্রজারা উপহার পেতেন একটি করে শোলার একপাতার মালা ও দু-চার টুকরো শশা, শাখালু, আখ এবং দু'চারটে বাতাসা। (তথ্য সূত্র ' পুরোনো দিনের গ্রাম বাঙ্গলা' - শ্রী শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / পৃষ্ঠা ১৫৭)।

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার

১। চক্রবর্তী সুমিতা - আধুনিক কবিতার চালচিত্র / পৃষ্ঠা ৬

২। চক্রবর্তী বিপ্লব - লোকাভরণ ঃ আধুনিক কবিতার শৈলী / পৃষ্ঠা ১৯-২০

৩। দাশগুপ্ত অমিতাভ - শ্রেষ্ঠ কবিতা/কবিতার নাম ঃ 'ভাসান ভাসান সারাবেলা'।

৪। দাশগুপ্ত অমিতাভ - শ্রেষ্ঠ কবিতা/কবিতার নাম ঃ 'পাসপোর্ট বিহীন বাংলাদেশ'।

৫। দাশগুপ্ত অমিতাভ - শ্রেষ্ঠ কবিতা/কবিতার নাম ঃ 'এখন গোধূলি লগ্ন, এখন বিবাহ'।

৬। দাশগুপ্ত অমিতাভ - শ্রেষ্ঠ কবিতা/কবিতার নাম ঃ 'ছিল'।

৭। Taylor Archer :'Folklore and the student of literture', The Pacific Spectator, vol. 2 (1948)/ Page 216.

৮। চক্রবর্তী বিপ্লব - লোকাভরণ ঃ আধুনিক কবিতার শৈলী পৃষ্ঠা ৪১৫

৯। ঘোষ শঙ্খ - কবি আর পাঠক, নিঃশব্দের তর্জনী, ১৪০৯, পৃষ্ঠা ৬৪

১০। বসু শিবতপন - বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি / পৃষ্ঠা ৫৭

১১। লোকসংস্কৃতি গবেষণা ঃ 'বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা নং ১৪ (১) / রেবতীমোহন সরকার-এর প্রবন্ধ 'বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংস্কৃতি / পৃষ্ঠা ৬৮

১২। চন্দ বীরেন - বিষয় ঃ বাংলাদেশ (সম্পাদিত)/ পৃষ্ঠা ৩৫৩

১৩। রায় অন্নদাশঙ্কর - ছড়া সমগ্র / 'লক্ষ্মী প্যাঁচা/ পৃষ্ঠা ১৪০

১৪। বসু গোপেন্দ্র কৃষ্ণ - বাংলার লৌকিক দেবতা / পৃষ্ঠা ৪৮

১৫। মিত্র সনৎ কুমার সম্পাদিত 'মেয়েলি ব্রতবিষয়ে' / পৃষ্ঠা ৬০

১৬। Frazer James George - The Golden Bough (Abridged Edition / Macmillan, 1959) / Page 12

১৭। দেব চিত্তরঞ্জন - বাংলা সাহিত্যে নারীর দান / পৃষ্ঠা ৬৭

১৮। মুখোপাধ্যায় সুভাষ - 'কাল মধুমাস' (কাব্য) / 'ভুবন ডাঙার বাউল এক'।

১৯। হাফিজ আবদুল - লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ / পৃষ্ঠা ৩৩৬ (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা)

২০। ঘোষ শিবশংকর - রাঢ়ীয় সংস্কৃতির সন্ধানে / পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

২১। গুপ্ত মণীন্দ্র - 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যের 'গাছপালা' কবিতা / পৃষ্ঠা ১১৮

২২। মাহমুদ অনীক / কাব্য ঃ 'এই সব ভয়াবহ আরতি' কবিতা ঃ 'আবাহন'।